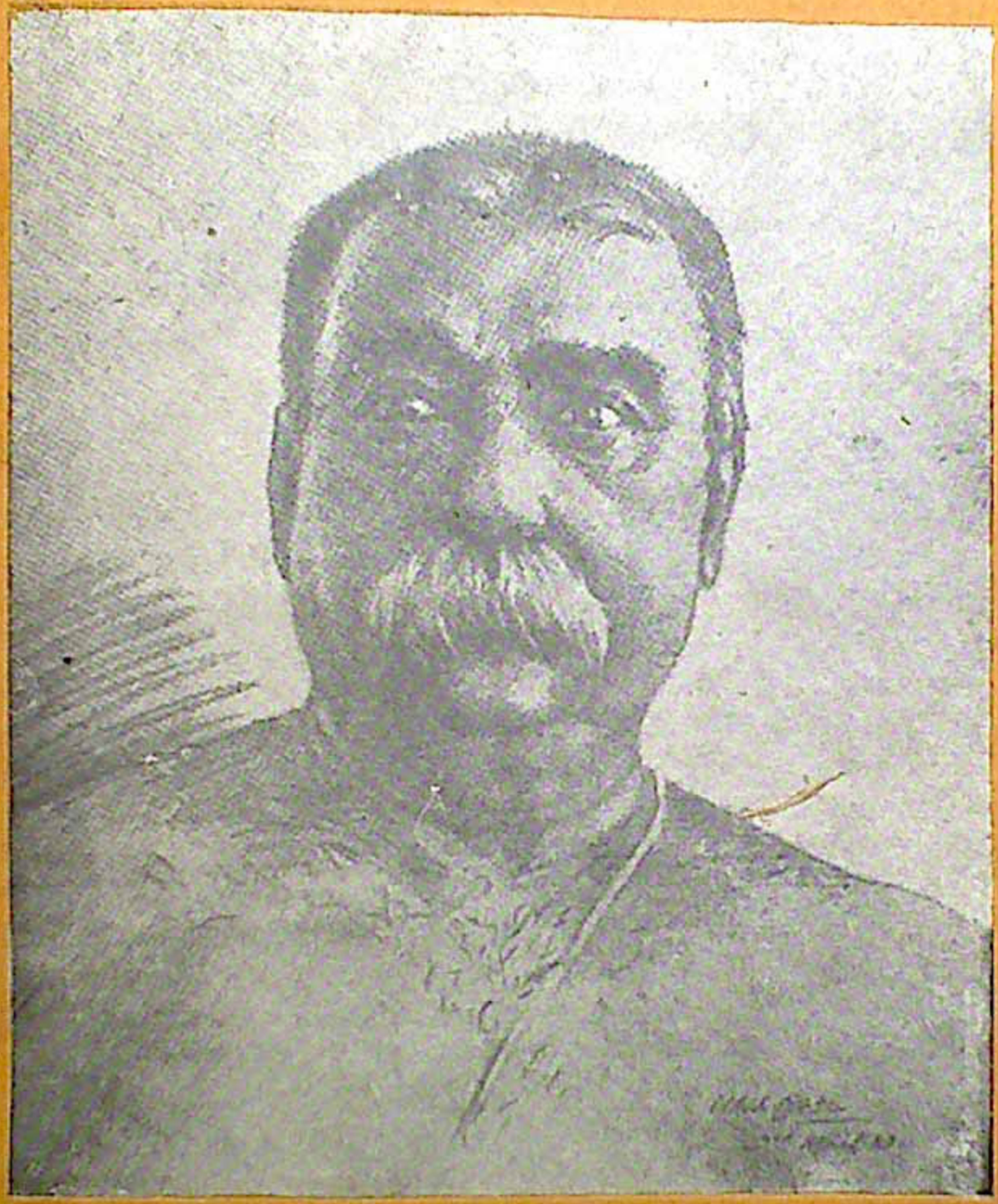

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

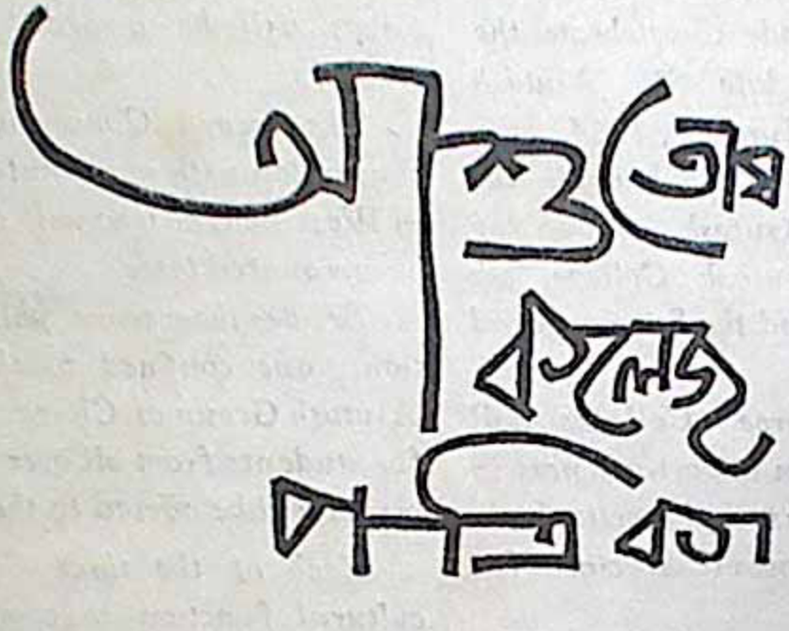

অষ্টত্রিংশ সংখ্যা

১৩৭০

॥ পত্রিকাধ্যক্ষ ॥

অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন বসু।

॥ যুগ্ম-সম্পাদক ॥

শ্রীজয়ন্তকুমার রায়।

শ্রীঅমিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

SIR ASUTOSH MOOKERJEE BIRTH CENTENARY

JUNE 29, 1964

ANNOUNCEMENT

We are glad to announce that suitable arrangements have been made to celebrate the birth centenary of the late Sir Asutosh Mookerjee which falls on June 29, 1964.

The celebrations will be held under the joint auspices of the Asutosh Group of Colleges, that is, the Asutosh College, the Jogamaya Devi College and the Syamaprasad College.

Students of the three Colleges will naturally have to play an important part in organizing the celebrations and particularly in the various functions meant specially for the students.

The celebrations will commence with a devotional gathering at 77, Asutosh Mookerjee Road, the ancestral home of Sir Asutosh, in the morning of June 29 when Puja and Hom will be offered and Prasad distributed. The building will be tastefully decorated and illuminated. The room in which Sir Asutosh used to sit and receive visitors would be thrown open to the public for paying their respects, from 9 to 12 in the morning and 7 to 9 in the evening of June 29.

The college buildings would be illuminated and flood lit. The Hostel buildings at 16, Basanta Bose Road and 22 Kalighat Road will also be illuminated.

In the evening of Tuesday, June 30th at the College, there would be a Memorial Meeting of the citizens of India presided over by a distinguished leader where the life and work of Sir Asutosh will be discussed. It will be followed by a cultural function arranged by "Gitanjali".

The Memorial Meeting will be followed, on dates to be specified later, by two Conventions. One of these Conventions, meant for College Students will be held at the College Hall with representatives from each College who will speak on Sir Asutosh for 5 minutes each and prizes will be awarded to the three best speakers.

The Second Convention will be a teachers' convention with representatives of all Colleges in West Bengal who will speak on a subject to be announced later.

Besides these there will be essay competitions, one confined to the students of the Asutosh Group of Clleges and another meant for students from all over India. Substantial prizes will be offered to the best competitors.

Each of the three Colleges will hold a cultural function to commemorate the occasion. These functions would be organized by the respective Student Unions. They will also bring out a special issue of the College Magazine devoted to the life and activities of Sir Asutosh Mookerjee and carrying special articles on educational problems of India and Bengal.

A Centenary Commemorative volume, one in Bengali and another in English, will also be brought out containing selections from the speeches and writings of Sir Asutosh Mookerjee. Prof. Bibhas Roy Chowdhury and Prof. Sadhan Kumar Ghosh have agreed to edit these volumes.

A Centenary Committee has been appointed to look after these arrangements. Its office will be located at 77, Asutosh Mookerjee Road, and will be under the over-all charge of Principal K. N. Sen.

Any offer or help from the students for making the celebration a success would be greatly appreciated. Those who are willing to work as volunteers for the various functions are requested to leave their names, the class to which they belong and their Roll Nos. with Sri Apurba Krishna Dutta, Librarian of the Asutosh College.

ঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ

২৯শে জুন। 'ভারত পুরুষ,' 'ভারত রত্ন,' 'বঙ্গ ভারতী,' কর্মযোগী মহাপুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শুভ পবিত্র জন্ম দিন। আজ থেকে ঠিক একশ বছর পূর্বে এই পুণ্য দিনে নব দিবাকরের শুভ আবির্ভাব ঘটেছিল পরাধীনতার শৃংখলে শৃংখলিতা শত ব্যথা-বেদনায় ব্যথিতা বাংলা মায়ের কোলে। বিধুরা বঙ্গভূমি সেদিন শুনেছিল আশার সিংহনাদ। তমসাচ্ছন্ন ভারতের ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়েছিল নবারুণের শুভ্র সমুজ্জ্বল কিরণোদ্ভাসিত হাসি। ধন্য হয়েছিল বাঙ্‌লা, ধন্য হয়েছিল ভারত।

আশুতোষের দীর্ঘ কর্মময় জীবনে শত বাধা বিপত্তি পর্ব্বত সমান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই পুরুষ সিংহের অমিত বিক্রমে সমস্ত বাধা বিপত্তি নিমিষে অবনত মস্তকে পথ থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। স্থির লক্ষ্যে পৌঁছেছেন সেই হিমালয় পুরুষ।

উত্তরাধিকারী আমরা। ঋণ শোধ করার দায়িত্ব আমাদের। কেবল সভা-সমিতির কলরোলে কোনোদিন এই ঋণ শোধ করা যায় না। ঋণ শোধ করতে হবে তাঁরই নির্দেশিত পথে চলার অঙ্গীকারে। ২৯শে জুন, সেই শপথ গ্রহণের দিন। তাঁর আবির্ভাব দিনটিকে করে তুলতে হবে সুন্দর, পবিত্র মঙ্গলময়। সাহসে, সততায়, বাস্তব প্রয়োজনে আশুতোষের উদ্‌যাপিত কর্মভার তারই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার, সার্থক সৈনিক হবার প্রতিশ্রুতি আজ ধ্বনিত হোক সবার কণ্ঠে। তাঁর মহাজীবনের মন্ত্রবাণী আমাদের পুনর্জীবিত পুনর্জাগ্রত করুক।

সেই মহৎ কর্ম জীবনে প্রবেশের সঙ্কল্পে প্রারম্ভিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের অন্তরোৎসারিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি সেই মহান পাদপদ্মে। কর্মবীর, তুমি গ্রহণ করো আমাদের প্রতি ছাত্রের, প্রতিটি অধ্যাপকের, প্রতিটি করণিকের, গ্রন্থাগারের প্রতিটি কর্মীর এবং প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি কর্মীর সশ্রদ্ধ প্রণাম। আশীর্বাদ করো তোমার আদর্শের বাহক তোমারই নামাঙ্কিত মহানিষ্ঠার তোমারই নির্দেশিত পথে হয়ে উঠুক সবাই সুন্দর, সার্থক।

জয়তু আশুতোষ।

২৯শে জুন, ১৯৬৯।
আশুতোষ কলেজ।

—পত্রিকাগোষ্ঠী।

স্মরণীয়ঃ— আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(জন্মঃ ২৯শে জুন ১৮৬৪ মৃত্যুঃ ২৫শে মে, ১৯২৪)

একদা তোমার নামে সরস্বতী রাখিলা স্বাক্ষর,
তোমার জীবন তাঁর মহিমা রেখিল নিরন্তর।
এ মন্দিরে সেই নাম উদ্‌ঘোষিত করুক তাঁরি জয়,
তাঁহার পূজার সাথে স্মৃতি তব হউক অক্ষয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Once the Goddess of wisdom
left her own Signature
upon your name,
and you maintained her majesty with all -
your Life.
Let that name of yours ever proclaim her -
triumph
Uniting your memory with her service in this -
Temple of Learning.

Rabindranath Tagore

ঃ পরিচিতি ঃ

প্রবন্ধ

সৌন্দর্য-তত্ত্ব ॥ ১ ॥ অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ॥ ১৬ ॥ অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

কবিতার অভিজ্ঞতা ॥ ২৩ ॥ অধ্যাপক শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ ও বাঙ্‌লা সাহিত্য ॥ ৪২ ॥ শ্রীস্বপনকুমার রায়

স্মৃতি-আলেখ্য

শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ — ॥ পত্রিকাধ্যক্ষ

স্মৃতি-মন্থন ॥ ১৩ ॥ অ-কু-ব

অধ্যাপক সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায় ॥ ৫৪ ॥ অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

ছোট গল্প

আরতি ॥ ২৯ ॥ শ্রীসুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত

ভ্রমণ-কাহিনী

নীল সাগরের দেশে ॥ ৫০ ॥ শ্রীধনঞ্জয় নস্কর

কবিতা

স্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি আজ ॥ ১১ ॥ শ্রীরমাপ্রসাদ দে

অন্তর গভীরে কান্না ॥ ১২ ॥ শ্রীতপন মুখোপাধ্যায়

ভালবাসা একটি ফুলের নাম ॥ ২২ ॥ শ্রীবিভাস চৌধুরী

শাণিত বিষাদ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীপার্থ রাহা

অনুভব ॥ ৩৬ ॥ শ্রীসমরেশ মজুমদার

শান্তি ॥ ৩৭ ॥ শ্রীশান্তশীল সেনগুপ্ত

আমি ॥ ৩৯ ॥ শ্রীঅমল চক্রবর্ত্তী

বাঁচার আশা ॥ ৪০ ॥ শ্রীকাজল বল

জীবন ঃ সময় ঃ আর্তনাদ ॥ ৪১ ॥ শ্রীকালীকৃষ্ণ গুহ

স্যার আশুতোষ স্মরণে ॥ ৫৮ ॥ শ্রীকমলাকান্ত বসু

গ্রন্থ-সমীক্ষা

— ॥ ৫৯ ॥ অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

— ॥ ৬২ ॥ অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন বসু

— ॥ ৬৩ ॥ অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

প্রতিবেদন

ছাত্র সংসদ-বার্তা ॥ /০ ॥ শ্রীবিধান চট্টোপাধ্যায়

বিতর্কের আসর ॥ ৶০ ॥ শ্রীপ্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কমন-রুম ॥ ।০ ॥ শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

ক্রীড়া-দপ্তর ॥ ।/০ ॥ শ্রীআশুতোষ ঘোষ

পুরাতন ছাত্রাবাস ॥ ।৶০ ॥ শ্রীগৌরমোহন সাহা

নতুন ছাত্রাবাস ॥ ।৶০ ॥ শ্রীগৌরীপ্রসাদ সিংহ রায়

রবীন্দ্রপাঠচক্র-সংবাদ ॥ ।৶০ ॥ শ্রীজয়ন্তকুমার রায়

সম্পাদকীয়

ENGLISH SECTION

Foreword ॥ — ॥ Principal K N Sen.

To Shakespere ॥ 1 ॥ Prof Ajit Krishna Basu.

The Pre-Raphaelites ॥ 3 ॥ Prof P. C. Sen Gupta.

Teaching as a Professien ॥ 7 ॥ Shri Sushanta Kumar Ray.

A Reminiscence of College-days ॥ 10 ॥ Shri Arunodoy Bhattacharyya.

H. G. Wells ॥ 12 ॥ Shri Debabrata Sarkar

ANNUAL REPORTS ॥ 14 ॥ —

Some Important Addition to the College Library ॥ 20 ॥ —

List of Editors ॥ 24 ॥ —

হিন্দী বিভাগ

নগীনো নিগাহেঁ বদলনী চেহরে ॥ ১ ॥ শ্রীসরদার জারনৈল সিংহ।

ছায়া ॥ ৩ ॥ শ্রীগোপালশরণ সিংহ।

ভুল সংশোধন :—রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' নামক কবিতাটির দ্বিতীয় লাইনে 'সেথিল'র পরিবর্তে 'ঘোষিল' হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

—সম্পাদক

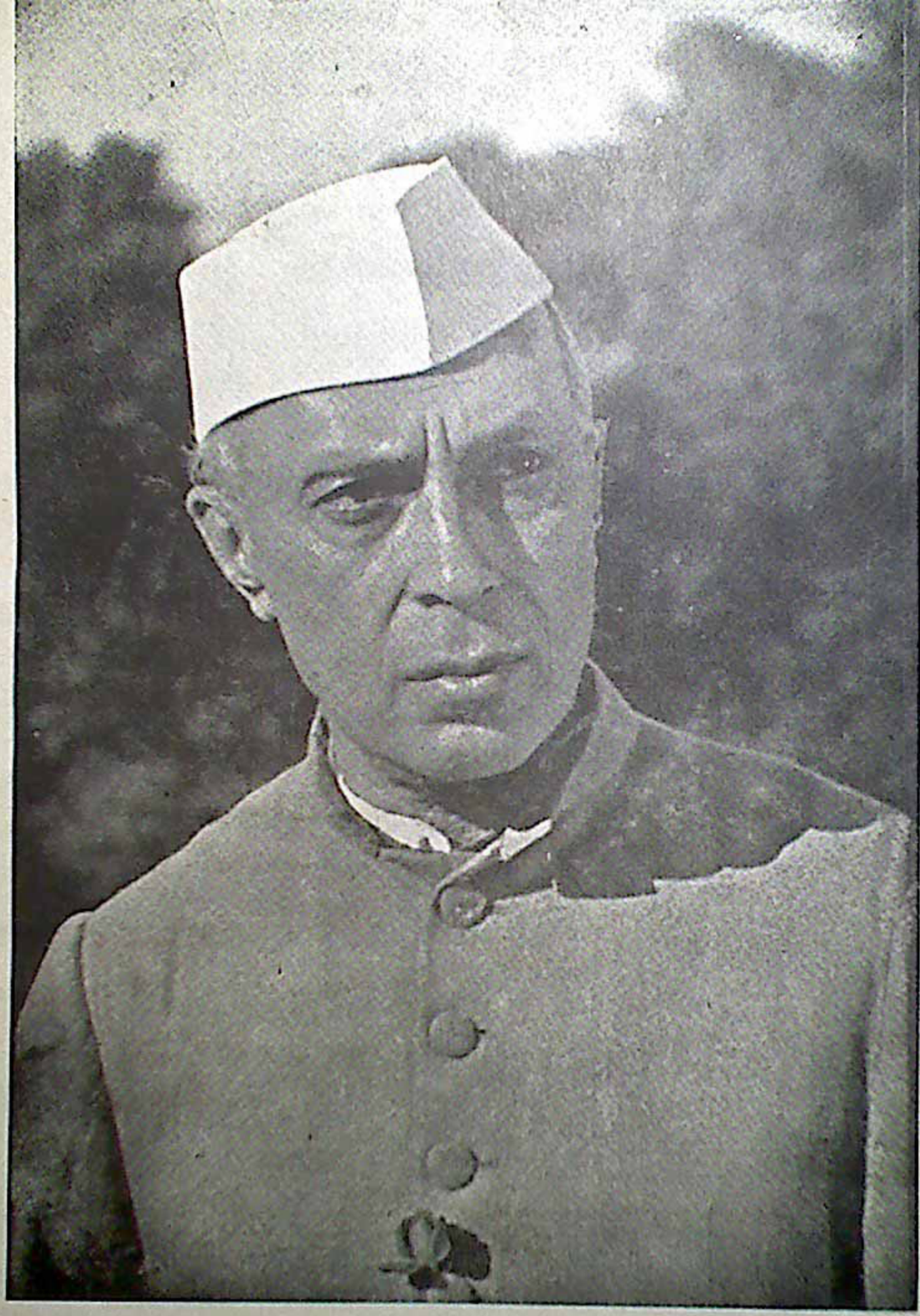

'নেহরু অমর রহে'

মহাজীবন

১৪ই নভেম্বর, ১৮৮৯

মহামরণ

২৭শে মে ১৯৬৪

জওহরলাল নেহরু নেই। 'দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু'। অসহায় আমরা ; কিন্তু দুর্বল নই—তাই সমগ্র বিশ্বের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলায়ে ঘোষনা করি 'নেহরু অমর রহে'। শোক সন্তপ্ত সমগ্র দেশবাসীর হৃদয় ঝরা অশ্রুর সঙ্গে আমাদের নীরব অশ্রু মিশায়ে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি বর্ত্তমান ভারতের রূপকার আমাদের পরম প্রিয় নেতা জওহরলালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। বিশ্বশান্তির নীতিতে অবিচল থাকার আদর্শ হোক ভারতের চিরন্তন আদর্শ।

পত্রিকাধ্যক্ষ

FOREWORD

I select as the text of the Foreword for this issue of the College magazine a subject of perennial interest to us, teachers and students, namely, the proper aim of education and the proper relations betwen the teacher and the taught. The subjects are time-worn but they have not lost their importance. The problems have to be re-posed for each new generation of students and, let me add, each new batch of teachers also.

Let me start with a simple illustration to show the complicated nature of the problems. Let us take the case of a doctor who has been called to examine a patient. He listens to the case history of the patient, sometimes from the patient himself, sometimes by questioning him or members of his family. Then he diagnoses the disease by applying his own knowledge of medical science and his experience. In this way he gets at the truth about his patient's precise ailments (assuming, of course, that he is a good and competent doctor) and finally prescribes the correct remedies. Now, the point is that the whole of this process is personal to the patient. The prognosis, the diagnosis and the prescription of medicines – in short, the whole 'treatment' of the patient – is entirely personal to him. Naturally it would be different for another patient, for no two patients are exactly alike, even when their ailments might appear to be the same.

What is true of the human body is also true, the moreso, of the human mind. The human mind is a unique thing. The English word. education, is derived from a latin root, *educere*, which means, to lead out, to bring out, to develop. Education, in other words, is meant to develop the faculties of the mind and of the body. Now, of these two, the mind and the body, the development of the mind which must include a proper understanding of its nature and processes, is much the more difficult. The teacher, like the doctor, must pay personal attention to the needs of every student, if he is to discharge effectively this defficult responsibility, to train and develop the mind of his pupil and help him attain truth.

This was the ideal of our ancient *Gurukula* system. It was not only based on the personal relationship between the Guru (the preceptor) and the shisya [the disciple] ; it was guided by a high moral purpose The young pupil used to leave his own home to enter the home of his teacher. Our Vedas say that in doing so, the pupil

was re-born into a different spiritual life in a new home. The final admonition of the Guru was delivered when the pupil was about to leave the h me of his preceptor, after finishing his education, to enter his own home [*Garhasthya Asrama*]. It was something tike a convocation address. The young 'graduate', after having taken a holy both [hence the term, 'snataka'] appeared before the Guru for his ashirbada, paid his Dakshina and received his exhortation thus :

"Speak the truth practise the virtues. Do not neglect the study of the shastras.

"Deviate not from the truth. Deviate not from dharma. Deviate not from what is good.

"Be not indifferent towards the attainment of greatness Be not indifferent towards the study of the Vedas and professing the same. Be not indifferent to your duty to your gods and your ancestors

"Honour your father, your mother, your Acharya (preceptor) and your guests as divine beings."

'Do only such work as do not attract any blame ; do not do any other (that is, any work that is condemnable) Whatever is to our good falls within the sphere of your duty, nothing else (that is anything that carries harm to people).

"If you come across your superiors, serve them so that they may relax (after their hard work)

"Give with respectful consideration. Do not give in a spirit of condescension. Give wisely. Give in a spirit of humility.

"Be firm as a rock. Be sharp as an axe. Be worthy as gold."

"This is my command. This is my advice. This is the essence of the Vedas. This is the rule. This is your duty.

"*Soumya*. may you live a hundred antumns"

Thus the teacher spoke to the pupil in the final and most significant and beautiful efflorescence of teacher-pupil relationship. The importance of this factor of personal relat onship could be traced in the organization of some of our ancient universities and Gurukul institutions. Some of these universities were qute big, even by modern standards, but the number of teachers also ran to hundreds, if not thousands. Hiuen-Tsang, the famous Chinese piligrim who lived as a student in the post-graduate University of Nalanda in the seventh century A. D. reported that there were 8500 students on the rolls with as many as 1510 teahcers. The great scholar Nagarjuna, and several other teachers

equally famous, were members of the staff of this University. We speak of over-crowding at Universities to-day. Sometimes we over-stress this point. We have already spoken of Nalanda Take the Vikramshila Mahavihara (near Bhagalpur in Bihar). In this Vihara, 8000 students would sit together to listen to the Acharya. Deepankar Shrijan Atish was one of the teachers here. Or take Taxila. The University of Taxila had a campus occupying an area of more than 12 square miles as recent excavations near Rawalpindi have shown. Even to-day the Harvard University and the Massachusetes I stitute of Technology, Boston, in the United States of America, have a very large number of students and an equally large faculty. The M. I. T has a staff of 1171 teachers for its 4874 students the ratio of teachers to students working out between 1 to 4 or 1 to 5. In other cases, it is 1 to 10. In our own College it is 1 to 20 (i.e. one teacher for 20 students) reached after the phased reduction of roll strength progresively achieved during the last 5 years. Even though it has now reached the ratio aimed at by the University Grants Commission, it is still much below what modern educational systems regard as ideal or even desirable.

Now, merely having a large number of teachers so as to improve the teacher pupil ratio is not enough. It is, course, a step in the right directi If even parents cannot adequat look after 5 or 6 children, how ca teacher, with more thar 10, 15 or students to look after, within a limi space of time, manage them bett This is all the more apparent when realise how difficult it is to bring ab that mental concentration which is the essence of education, when tr unfolds it self in all its majesty to dedicated soul.

The teacher's privilege is to gu the young learner in the path leadi to the attainment of Truth and Bea through self-knowledge, self-critici and self-realisation. Even the gr Narada, as the Upanishades say, vers in all the religious texts and the fi Arts, had to exclaim in frustratio "I have become learned in all the sh tras but not in the Truth." Our Pre dent, Sir Sarvapalli Radhakrishn has said : "the chief purpose of educati according to Indian thought, is not t acquisition of skills and informati only but to qualify for initiation into higher life, into a realm of thoug which transcends the world of spa and time."

It is thus that education unfol it self as a *diksha*—initiatian into higher and nobler life-- with the h

of the teacher, no doubt, but, in an increasingly large measure, as the result of the student's own efforts to discipline himself and bring about that mental concentration without which no true learning is possible. This discipline requires three steps or stages in the process of acquiring knowledge : (i) Sravana (ii) Manana and (iii Nididhyasana. "Sravana" refers to the knowledge that is obtained by the student by hearing directly from the l ps of the preceptor—it is called '*Sruti*'. 'Manana' refers to the process of thought for mental assimilation of the lessons, taught by the teacher. 'Nididhyasana' means the complete comprehension or realisation of the truth that is imparted through the lessons, so that the pupil may live this truth in his own life.

It will be seen that both *Manana* and *Nididhyasana* proceed from the student's own mental discipline and self-realisation. Unfortunately, the student's mind (and for that matter, the, teacher's also) is distracted by the world of matter in different ways which must be overcome by never-ceasing efforts on the part of the seeker after truth. Patanjali, the psychologist, has enumerated five states through which the mind, the 'Chitta-bhumi' may have to pass before it can be completely absorbed in the objects of its contemplation. They are (1) Kshipta (2) Mudha (3) Bikshipta (4) Ekagrachitta and (5) Niruddha. Most of our students find it impossible to get out of the first two or three states ; and yet, unless they have developed the capacity of concentrated thought and of thoroughly identifying themselves with the quest after truth, the great adventure of education will have been in vain.

In conclusion I must only tell you that learning is a serious business and that you will be in the college for only a few years which are too precious to be wasted in triviliaties. There is no short cut to knowledge. Awaken your mind, and you will soon find what a huge fund of hidden energy it has. Do not allow yourself to think that you are not 'bright' that you are backward that you will be quite-satisfied if you somehow secure a pass mark, say, with a few marks of 'grace' (or disgrace ?). If you tell yourself that you can, by conscious and concentrated effort, be as good as if not better than, the best boy in the class, your mind is sure to respond It is because you are not aware of the hidden resources of your mind that you permit yourself to be swayed from the path of your obvious duty to yourself. So, shake off your lethargy, put your shoulder to the wheel, and remember that we are here to help you in your march forward. God be with you.

—**Khagendra Nath Sen**
Principal.

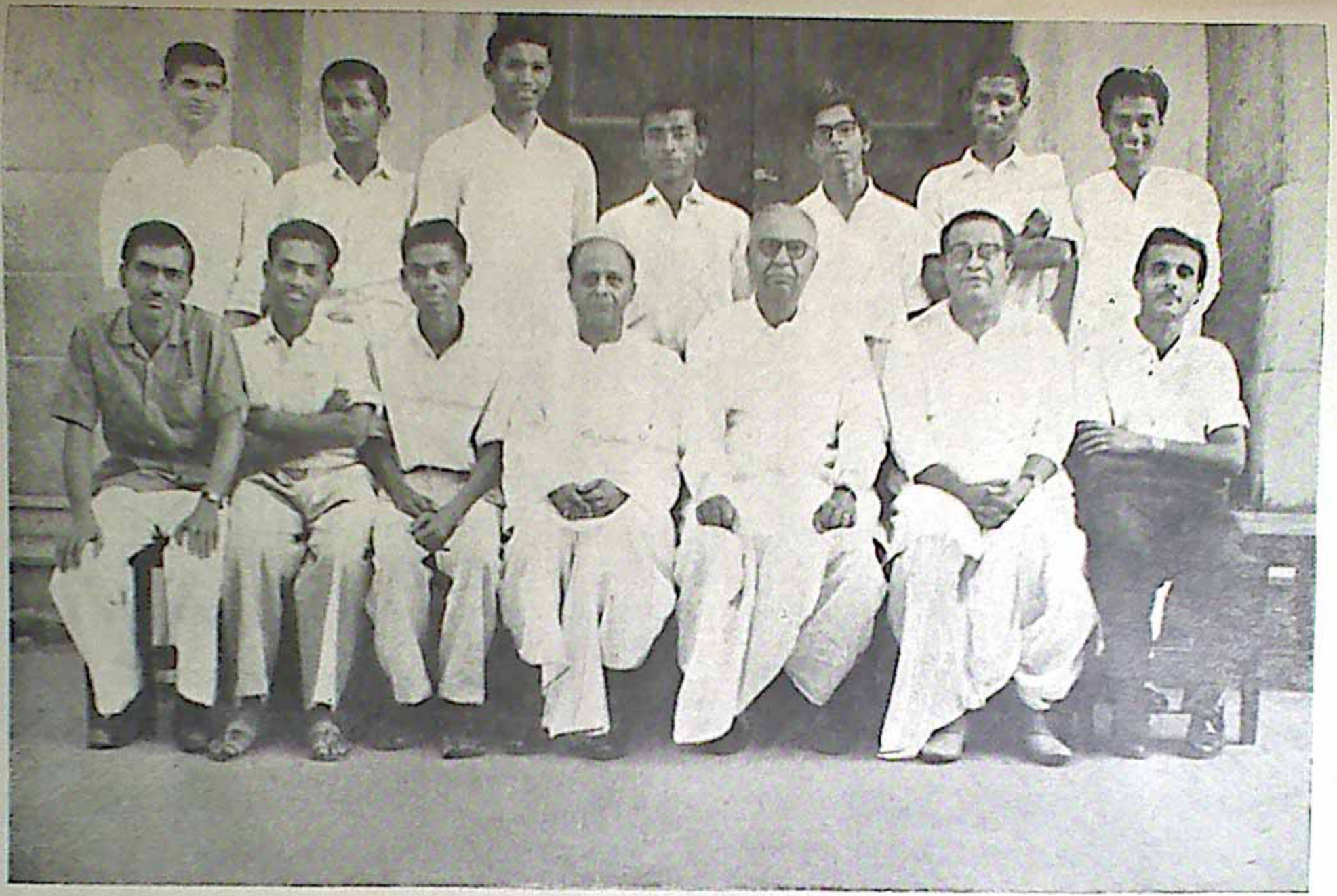

Sitting (from L to R) Amalendu Ganguli (V. President), Asutosh Ghosh (Games Secy.), Prabir Sengupta (Gen. Secy), Vice Principal N. K. Bhattacharya, Pricipal K. N. Sen, Prof. Biswanath Chakravarty (President) Asit Banerjee (Cultural Secy) *Second Row :* Jayanta Roy (College Magazine Editor), Some Nath Chowdhury, Sambhu Prosad Mazumder, Dhiraj Dhar, Bidhan Chatterjee Asst. G. Secy), Prantosh Banerjee (Debate Secy), Shyamal Roy.

॥ সৌন্দর্য তত্ত্ব ॥

—অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

মানুষের সম্পর্কে জগতের বস্তু দ্বিবিধ—জ্ঞেয় ও ভোগ্য। মস্তিকের দ্বারা গ্রহণ ও বুদ্ধিতে বুঝার নাম জ্ঞান এবং গ্রহণীয় বস্তুর নাম জ্ঞেয় বস্তু। হৃদয়ের দ্বারা গ্রহণ বা অনুভব করার নাম ভোগ এবং গ্রহণীয় বস্তু—ভোগ্য বস্তু। বস্তুটি কী তাহা স্থির করাই জ্ঞান, বস্তুটি কেমন তাহা বোধ করাই ভোগ। ভোগের অপর নাম আস্বাদন। সৌন্দর্য সাধারণতঃ ভোগ্য বস্তু, কিন্তু ভোগ কখনও কোন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ভোগ ও ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করাই উদ্দেশ্য। 'ছন্দো-বিজ্ঞানে' সৌন্দর্য জ্ঞানেরই বিষয়, ভোগের বিষয় নহে।

ভোগের ক্ষেত্র হইতেছে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়তঃ মন। সেই জন্য ভোগ দ্বিবিধ—শারীর ও মানস।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক হইতেছে বহিরিন্দ্রিয়। বহিরিন্দ্রিয়ে স্নায়বিক ক্রিয়া হয় মাত্র। বহিরিন্দ্রিয়ের নিজের চেতনা নাই, সেইজন্য কেবল বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব বা ভোগ সম্ভব নহে। মনই চেতন, মনেই সর্ব্ববিধ ভোগ সম্ভব। কিন্তু মনের দুই অবস্থা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল মন দেহের অধীন, সূক্ষ্ম মন স্বাধীন ও দেহাতিক্রমী। চক্ষুকর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত স্থূল মনের সংযোগেই আমাদের রূপরসাদির অনুভূতি ঘটে। সেই জন্য স্থূল মনের অপর নাম—অন্তরিন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় ভোগ বা শারীর ভোগ অর্থে এই অন্তরিন্দ্রিয় বা স্থূল মনের সহিত মিলিত বহিরিন্দ্রিয়ের ভোগই বুঝিতে হইবে। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের বো (Perception) শারীর ভোগের দৃষ্টান্ত।

মানস ভোগ সূক্ষ্ম মনের ক্রিয়া। এই স্বাধীন, দেহ-নিরপেক্ষ ও সমস্ত শক্তির উৎস চিন্তা অনুভূতি ইচ্ছা ইহার বৈশিষ্ট্য। স্থূল দেহের দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহকেই পরিচালিত করে। বোধ (Perceptio নহে, স্নেহ-প্রেম বিরক্তি উৎসাহ প্রভৃতি অনুভূতি (feeling) মানস ভোগের দৃষ্টান্ত।

শারীর ইন্দ্রিয়ে প্রিয়তাবোধের নাম আরা অপ্রিয়তাবোধের নাম যন্ত্রণা বা কষ্ট। ম প্রিয়তাবোধের নাম আনন্দ, অপ্রিয়তাবো নাম বেদনা। একত্র শরীর ও মনের সাধা প্রিয়তা—সুখ এবং অপ্রিয়তা দুঃখ।

সৌন্দর্যতত্ত্বে প্রিয়তাবোধ অর্থাৎ আরাম, বা আনন্দের আলোচনাই মুখ্য। অপ্রিয়বো আলোচনা গৌণ, উহা মুখ্য আলোচনা হই অনুমেয়। প্রিয়ভোগ্য দ্বিবিধ—রম্যতা ও সৌন্দ

বস্তু নিহিত যে বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে আমাদি শরীরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে 'আরাম' উপভোগ হ তাহার নাম—'রম্যতা।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের পুষ্টতা, পরিণতি ক্রিয়া শীলতার উপরেই 'আরামে'র তারতম্য নি করে।

নয়নে রূপের লাবণ্য, শ্রবণে ধ্বনির মিষ্ট নাসায় গন্ধের স্নিগ্ধতা, জিহ্বায় রসের মধুরতা, গা স্পর্শের কোমলতা 'রম্যতা'র বিভিন্ন দৃষ্টান্ত।

াস্থ্য সঞ্চার করে ও জীবন রে বলিয়াই শরীরের আরাম- র প্রয়োজনেই ইহার উদ্ভব। রর মনে ইন্দ্রিয় সেবার বাসনা উৎপাদন করে।

ও ইহাতে ভোক্তা ভোগ্যবস্তুর ইচ্ছা অনিচ্ছার সহিত ইহার ম অগ্নি সংস্পর্শে গাত্রে প্রদাহ, জিহ্বায় মিষ্টতা বোধ হইবেই। কিলেও রম্যতা স্পর্শে ভোক্তা ারীরিক আরাম ভোগ করে ভোগবাসনা থাকিলে সেই াসনা তৃপ্তির আনন্দ মিশ্রিত নর সুখ ভোগ ঘটে,

াও বটে। শুধু মানুষ কেন, ত্তর রম্যতা ভোগে অধিকারী। উৎকর্ণ হয়, মেঘ মন্দ্রে ময়ূর নর উন্মত্ত হয়, আগুনের রূপে ড়িয়া মরে।

কখন কখন মানুষের রুচিভেদ জন্য রম্যতার বস্তু ধর্মে ও সর্ব্ব- রা অযৌক্তিক। কোন কোন যে একের রসনায় যাহা প্রিয়, তাহাই অপ্রিয়। লঙ্কার ঝাল কেহ বা করে না। কিন্তু এই নভাব জাত নহে, ইহা কৃত্রিম

বস্তুনিহিত যে বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে মানুষের স্বাধীন মনঃশক্তির উদ্বোধন ঘটে ও তদ্দ্বারা ভোক্তা মানস আনন্দ ভোগ করে, তাহার নাম 'সৌন্দর্য্য'।

এই মন হইতেছে স্বাধীন মন, ইন্দ্রিয়াধীন স্থূল মন বা অন্তরিন্দ্রিয় নহে। মনঃশক্তি বলিতে পরিমার্জ্জন, পরিবর্জ্জন, সংযোজন, সমঞ্জসীকরণ, শৃঙ্খলা স্থাপন, সংরচন প্রভৃতি সূক্ষ্ম মানস ক্রিয়া বুঝিতে হইবে।

সৌন্দর্য 'রম্যতা' নহে। রম্যতা প্রত্যক্ষ, সৌন্দর্য পরোক্ষ। রম্যতা ভোগ ইন্দ্রিয়ে, সৌন্দর্য ভোগ মনে। ভোক্তা রম্যতাভোগে ভোগ্যবস্তুর অধীন, সৌন্দর্যভোগে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। রম্যতাভোগে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস, সৌন্দর্য ভোগে আমরা পরিমার্জ্জন, পরিবর্জ্জন, সংযোজন, সমঞ্জসীকরণ, কল্পনা ও বিচিত্র ভাব এবং চিন্তার সংরচন প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ মানসিক ক্রিয়ার কর্তা। রম্যতাভোগে আমাদের দৈহিক জীবনের বর্দ্ধন, সৌন্দর্যভোগে আমাদের চৈতন্য- জীবনের স্ফূরণ ও বিস্তার। রম্যতায় আমাদের আরাম, সৌন্দর্যে আমাদিগের সুখ ও আনন্দ।

সৌন্দর্যের দুই বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য প্রথমতঃ সৌন্দর্য মানবচিত্তের ভোগ সাপেক্ষ। প্রাণিমধ্যে মানুষেরই মন সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিণত, সেইজন্য একমাত্র মানুষই সৌন্দর্য ভোগের ও মানসিক আনন্দের অধিকারী।

সৌন্দর্যের কারণ থাকে যেখানে, প্রকাশ

প্রাণীর কর্ণে ও চক্ষুতে। সৌন্দর্যর ব্যাপারও এই প্রকার। মানবচিত্তই সৌন্দর্যের গ্রাহক-যন্ত্র (Receiver)। সেইজন্য মানবচিত্তের ভোগেই সৌন্দর্যের সার্থকতা।

সৌন্দর্যের বিচারে মানব চিত্ত-রূপ গ্রাহক যন্ত্রের সাক্ষ্যই প্রামাণিক। যাহাতে কখনও কোন মানুষ সুখবোধ করিতে পারে না, তাহা সুন্দর নহে। একটি শকুনের রূপ দেখিয়া শকুন সম্প্রদায় তৃপ্ত হইতে পারে, অথবা একটি গাধার ডাক শুনিয়া অন্যান্য গাধা মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু মানুষ কখনও তৃপ্ত ও মুগ্ধ হয় না। সুতরাং পশু-পক্ষীর মতামত উপেক্ষা করিয়াই বলা যাইতে পারে—শকুনের রূপ বা গাধার ডাক সুন্দর নহে।

দ্বিতীয়তঃ মানব চিত্ত সাপেক্ষ হইলেও সৌন্দর্য ব্যক্তিগত বা ক্ষণিক নহে, ইহা বস্তুগত স্থায়ী ও সত্য পদার্থ।

মানব চিত্ত-সাপেক্ষ হইলেও কোন কিছু ব্যক্তিগত বা বস্তু বিজ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া যায় না। আলোক, উত্তাপ, ধ্বনি ইহারা মানবের অন্তরিন্দ্রিয় বা মানস-বোধ সাপেক্ষ; তথাপি ইহারা বস্তুগত এবং বস্তুবিজ্ঞানের আলোচ্য। সৌন্দর্যও সেইরূপ।

সৌন্দর্যের বস্তুগত অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একদিকে রাজহংসের রূপ ও অন্যদিকে শিশুর শিশুত্ব উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাজহংসের সৌন্দর্য যদি ব্যক্তিগত খেয়াল হইত, তাহা হইলে দৈবাৎ একজন মাত্র ইহাতে আনন্দ পাইতেন, কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই রাজহংস দেখিয়া খুসী হয়, বিভিন্ন যুগের কাব্যে, চি সংগীতে, শিল্পী ও কবিগণ রাজহংসের সৌ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

শিশুর সৌন্দর্য যদি একটি বিশেষ জননী পক্ষে সত্য হইত তাহা হইলে তাহাকে ক্ষ ও ব্যক্তিগত ব্যাপার বলা চলিত; কিন্তু স দেশের সকল কালের সকল জননীই শিশু সন্তা সংসর্গে খুসী না হইয়া পারেন না।

সৌন্দর্য বস্তুগত বলিয়াই সাধারণের প উহাতে খুসী হওয়া সম্ভব হয়। মানুষের হৃ আস্বাদিত না হইলে সৌন্দর্য ব্যর্থ হয় বটে, কি তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না। পৃথিবীতে মা আবির্ভূত হইবার পূর্বে যে সৌন্দর্য ছিল না মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছে, তাহা ন জগতের সৌন্দর্য বহুকাল মানুষের ভোগের অপেক্ষা করিয়াছে এবং এখনও অপেক্ষা করিতে ইহাই সৌন্দর্যের যথার্থ ইতিহাস।

সৌন্দর্য দ্বিবিধ; বস্তুর প্রকৃতিগত সৌ হইতেছে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং আকৃতিগত সৌ হইতেছে স্থূল সৌন্দর্য।

প্রকৃতিগত সৌন্দর্য বস্তুতে অতি সূক্ষ্মর অবস্থান করে। সেইজন্য ইহার নাম সূক্ষ্ম সৌন অপরিণত-চিত্ত ব্যক্তির কাছে ইহা সুপ্তই থা পরিণত-চিত্ত অর্থাৎ সহৃদয় মনস্বী ব্যক্তির সংস্প আসিলেই উহা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র প ইহারই প্রভাবে সুপরিণত মন নূতন অর্থ আবি বা ভাব সৃষ্টিতে বাধ্য হয়; ফলে আপাত দৃ শ্রীহীন বস্তুর সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং ভো

সৃষ্টি ও আবিষ্কারের মানস আনন্দ উপভোগ করে। যেমন আলোকের কারণ স্বরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি বিদ্যুৎ প্রবাহ যুক্ত তারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই জ্যোতিময় হইয়া উঠিয়া চারিদিক উদ্ভাসিত করে, ইহাও অনেকটা সেই প্রকার।

শিশুত্ব সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের একটি দৃষ্টান্ত। হৃদয়-হীন ব্যক্তির কাছে ইহার সৌন্দর্য পরিস্ফুট নহে। কিন্তু সহৃদয় পুরুষ ও স্নেহশীলা নারীর মধ্যে উহা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়, তাহাদের চিত্তকে করুণা ও বাৎসল্য সৃষ্টিতে বাধ্য করে। এই সৃজনের আনন্দের মধ্য দিয়া শিশুকে দেখিলে তবেই তাহার অপরিস্ফুট সৌন্দর্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

যেমন পিতামাতার কাছে শিশুর সৌন্দর্য, তেমনি সুপণ্ডিত গণিতবিদের কাছে উচ্চতর গণিতের তত্ত্ব-সৌন্দর্য, সমজদার শ্রোতার কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল সঙ্গীতের সৌন্দর্য—ইহারা ভাষা-বহির্ভূত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত। এই সকল সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের দৃষ্টান্তে সাধারণতঃ বাহ্য ও সহজ সৌন্দর্য থাকে না বলিয়া ইহারা অনধিকারীর কাছে দুর্বোধ্য। পঙ্গু বা অপরিণত মনের সৃষ্টিশক্তি থাকে না, সেইজন্য ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের উপভোগ সম্ভব হয় না।

অন্ধ যেমন বর্ণকে সত্য ও বস্তুগত বলিয়া ভাবিতে পারে না, অনধিকারী ব্যক্তিরাও তেমনি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত ও মিথ্যা কল্পনা-বিলাস বলিয়া মনে করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অন্ধের যুক্তি স্বীকার্য নহে। সৌন্দর্য সূক্ষ্ম হইলেও সত্য ও চিরন্তন।

আকৃতিগত সৌন্দর্য স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে বা জীবদেহে অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিতে পারা যায়, সেইজন্য ইহাকে বলে স্থূল সৌন্দর্য।

স্থূল সৌন্দর্য দ্বিবিধ—দৃষ্টিগত ও শ্রুতিগত। মন্দিরের গঠন, রাজহংসের চলন, বিল্বপত্রের আকৃতি ময়ূরের নৃত্য—ইহারা দৃষ্টিগত স্থূল সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত এবং অপর পক্ষে সঙ্গীতের রাগিনী, নদীর কল্লোল, কাব্যভাষার উচ্চারণ শ্রুতিগত স্থূল সৌন্দর্যের উদাহরণ।

স্থূল সৌন্দর্যে রম্যতার ন্যায় বর্ণ-লাবণ্য বা ধ্বনি-মাধুর্য প্রাধান্য পায় না, রূপের আকৃতি অথবা ধ্বনি প্রবাহের গঠন অর্থাৎ 'ফর্ম'ই (form) উপভোগ্য হইয়া উঠে। 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে গ্রন্থকার রূপ গোস্বামী নয়নাভিরাম বর্ণ বা শ্রুতি সুখকর ধ্বনিকে সুন্দর বলেন নাই, সৌন্দর্য বলিতে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ ও সুশ্লিষ্ট (মানান সই) সংযোগই বুঝাইয়াছেন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকানাং চ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্ট সন্ধিবন্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্য মিতীর্যতে॥

—ইহাই স্থূল সৌন্দর্যের প্রকৃত অর্থ। মহাভারতে কৃষ্ণাঙ্গী দ্রৌপদীকে সুন্দর গঠনের জন্যই সুন্দরী বলা হইয়াছে।

স্থূল সৌন্দর্যের উপভোগে আমাদের চক্ষু উপভোগ্য রূপের আকৃতিকে অথবা আমাদের কর্ণ ধ্বনি প্রবাহের গঠনকে অনুসরণ করে। ইহারা উপভোগ্য বস্তুর অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ক্রমিক স্নায়বিক প্রবাহ সৃষ্টি করে। আমরা অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রমশঃ এই প্রবাহগুলি বোধ

করি। এই খানেই শারীরিক ক্রিয়ার সমাপ্তি এবং স্বাধীন মনের ক্রিয়ার সূচনা। মন উক্ত দৃষ্টি-লব্ধ বা শ্রুতিলব্ধ ক্রমিক স্নায়বিক প্রবাহগুলিকে বিন্যস্ত, ঐক্যবদ্ধ ও সুসজ্জিত করিয়া নিজের স্বাধীন কর্ম্মশক্তির পরিচয় দেয়, ঐক্যের অনুকূল অংশগুলির সমঞ্জসীকরণ করে এবং প্রতিকূল অংশগুলির সংশোধন বা উপেক্ষা করে। স্থূল সৌন্দর্যে মন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্নায়বিক প্রবাহের কতকটা দাসত্বই করে; সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যেমন মন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নূতন ভাব ও অর্থ সৃষ্টির সূক্ষ্ম আনন্দ পায়, স্থূল সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সে আনন্দ পায় না, কেবল সক্রিয়তার সাধারণ জীবনানন্দই অনুভব করে। তবে ইহাতে দেহ ও মন উভয়ই পরিচালিত হয় বলিয়া আমাদের প্রাণধর্ম্মও তৃপ্তিলাভ করে।

[ছন্দের ক্ষেত্রে মনের দ্বারা ধ্বনিপ্রবাহের গঠনগত সৌন্দর্যের প্রতিকূল অংশ সংশোধনের চেষ্টায় শব্দ সংকোচন, শব্দ প্রসারণ ও শব্দ সন্ধির উৎপত্তি।]

স্থূল সৌন্দর্য মানব মাত্রেই উপভোগ্য, ইহাতে অধিকারী-অনধিকারীর ভেদ নাই।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে—ভোক্তার প্রিয়তা রম্যতায় বিষয়গত, স্থূল সৌন্দর্যে আকৃতিগত এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে ব্যঞ্জনাগত। রম্যতায় কেবল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে কেবল মনের ক্রিয়া এবং স্থূল সৌন্দর্যে ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণ সকলের ক্রিয়া। রম্যতা অধিকাংশ জীবের, স্থূল সৌন্দর্য কেবল মানবের এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য কেবল 'অধিকারী' ব্যক্তির উপভোগ্য।

আকৃতিগত স্থূল সৌন্দর্যই সম্পূর্ণ ও সামগ্রি সৌন্দর্য, ইহারই অন্তর্গত ছন্দ।

রম্যতা কেবল দেহধর্ম্মকে মানিয়া চলে মনোধর্ম্মকে অস্বীকার করে এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল মনোধর্ম্মকেই আ করে, সেইজন্য ইহাদিগকে আংশিক বা সৌন্দর্যই বলিতে হয়। অপর পক্ষে স্থূল সৌ অর্থাৎ আকৃতিগত সৌন্দর্য মানবের দেহ মন প্রাণ সকলকে মানিয়া চলে এবং সকলকেই তৃ দান করে। সেইজন্য স্থূল সৌন্দর্যই প্রকৃত অখণ্ড সামগ্রিক সৌন্দর্য।

ছন্দ শ্রুতিগত স্থূল সৌন্দর্য; সেইজন্য ই সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক সৌন্দর্যই বটে।

অতএব—

"যে-ভাবে পদ-বিন্যাস করিলে বাক্য শ্র মধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয় তাহা ছন্দঃ বলে।"—ছন্দ সম্বন্ধে এই ধারণা আপত্তিক কারণ, প্রথমতঃ শ্রুতিমধুরতা অর্থাৎ ধ্বনি-মা রম্যতারই অন্তর্গত, দ্বিতীয়তঃ 'রসের সঞ্চার' স সৌন্দর্যের ধর্ম্ম; এই দুইটির কোনোটিই ছ বৈশিষ্ট্য নহে। ছন্দ রম্যতা হইলে উহা ই প্রাণীরও আস্বাদ্য হইত এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্য হই সাধারণ মানুষের দুরধিগম্য হইত; ছন্দ এই প্র নহে। ইহা মাধুর্য নহে, সৌন্দর্য। এই সৌ ধ্বনির আকৃতিগত স্থূল সৌন্দর্য মাত্র। ধ্বনির লালিত্যে মধুর হয়, কিন্তু সুন্দর হয় গুণে।

ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের আকৃতিগত সে

বৈশিষ্ট্য মানবের প্রাণ, মন ও দেহের অনুকূল তাহারাই সৌন্দর্যের যথার্থ উপাদান।

সৌন্দর্য মানবভোগ্য, সেইজন্য মানব-জীবনের অনুকূল হইতে বাধ্য। কোন বিষয় যদি মানবের প্রাণধর্ম, মনোধর্ম বা দেহধর্মের প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে মানব তাহাতে সুখবোধ করিতে পারে না। অপরপক্ষে যাহা দেহমন প্রাণধর্মের সহায়তা করে, তাহা প্রিয় হইয়া উঠে এবং সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। মানব-ভোগ্য বলিয়াই সৌন্দর্য নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ মানবের প্রাণ মন দেহ তিনটিরই দাবী তাহাকে মিটাইতে হয়। নারী বর্ণে গৌরাঙ্গী হইলেও যদি রুগ্ন, কোটরাক্ষী ও কঙ্কালসার হয়, অথবা অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সুন্দরী বলা চলে না।

ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের 'অঙ্গ-বহুত্ব' হইতেছে সৌন্দর্যের প্রাণধর্মী উপাদান।

প্রাণের ধর্মকর্মচঞ্চলতা ; দেহ ও মনকে পরিচালিত করাই প্রাণের কাজ। যে কোন ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় প্রাণধর্মের অনুকূলতা হয় বলিয়াই সুখলাভ ঘটে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়েরই ভোগশক্তি সীমাবদ্ধ ; একেবারে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে ; অতএব কেবল পরিমিত ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগেই সুখলাভ হয়। ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য বস্তুর রম্যতা আমাদের ভালো লাগে কিন্তু এই ভালো লাগা ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তের সুখ অল্পসুখ মাত্র। অল্পসুখে তৃপ্তি নাই, তাই অল্পসুখ প্রকৃত সুখ পদবাচ্য নহে। সেইজন্য বস্তুর রম্যতাকে সৌন্দর্যের মধ্যে ফেলা চলে না। পরিমিত ভাবে অল্প অল্প করিয়া বহুবার ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যথার্থ সুখ প্রাপ্তি ঘটে। সেই জন্য বারংবার ইন্দ্রিয় ভোগের সুযোগদান করিবার শক্তিই হইতেছে সৌন্দর্যের প্রাণধর্মী উপাদান।

মানবের একমাত্র চক্ষু ও কর্ণ সুপরিণত বলিয়া যথার্থ সৌন্দর্যবোধের ইন্দ্রিয়, সেইজন্য সুন্দর হইতে গেলে বস্তুকে এরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হইতে হয় যাহাতে আকৃতির অনুসরণ করিতে গিয়া আমাদের চক্ষু বা কর্ণের বারংবার পরিমিত শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়। এইজন্য সিদ্ধান্ত করিতে হয়—সৌন্দর্য অঙ্গগত বহুত্ব-সাপেক্ষ।

কেঁচোর আকৃতি সুন্দর নহে, কিন্তু সাপের আকৃতি সুন্দর। ইহার কারণ, কেঁচোর সরল রৈখিক দেহভঙ্গিতে বহুত্বসূচক অংশ বুঝা যায় না ; অপর পক্ষে সাপকে আঁকাবাঁকা রেখায় তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে দেখা যায়, তাহার গঠনে অংশ বহুত্ব সুস্পষ্ট।

[সুন্দর হইতে গেলে 'বহু'র প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু বহু থাকিলেই বস্তু সুন্দর হয় না। বহু জনের সমাবেশ-জাত জনতা সুন্দর নহে। নানা ধ্বনির সমাবেশে উৎপন্ন হট্টগোল সুন্দর নহে।

প্রাণধর্মী উপাদান সৌন্দর্যের একটি উপাদান মাত্র। একটি উপাদানেই সৌন্দর্য গঠিত হয় না।]

অঙ্গ-সংহতি মূলক শৃঙ্খলাই সৌন্দর্যের মনোধর্মী উপাদান। চিন্তা-অনুভব-ইচ্ছা এই ত্রিবিধ ক্রিয়া সত্ত্বেও মন একটি অখণ্ড সত্তা। এই মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমরা বস্তু বা বিষয়ের পূর্ণতা প্রত্যাশা

করি। অপূর্ণতা মনোধর্মের প্রতিকূল ও সেই জন্য পীড়াদায়ক; পূর্ণতা মনোধর্মের অনুকূল ও সেই জন্য আনন্দপ্রদ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত একটি পূর্ণগঠিত মন্দির বা সম্পূর্ণাঙ্গ দেবমূর্তি সুন্দর, কিন্তু ভগ্ন মন্দির বা অঙ্গহীন মূর্তি কুৎসিত। শূর্পনখার ন্যায় ছিন্ননাসা নারী কুৎসিতই বটে।

[ভগ্ন মন্দিরে বা অঙ্গহীন মূর্তিতে কখনও কখনও শিল্পী ও কবি সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু আবিষ্কৃত সৌন্দর্যকে স্থূল আকৃতিগত সৌন্দর্য বলা চলে না, প্রকৃতিগত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যই বলিতে হইবে।]

সৌন্দর্য-বহুত্ব সাপেক্ষ বটে, কিন্তু যেখানে এই বহু পরস্পর স্বতন্ত্র, সেখানে মনোধর্মের প্রতিকূলতার জন্য মানুষ তৃপ্তি পায় না এবং সৌন্দর্য বোধ করিতে পারে না, সেইজন্য জনতা বা হট্টগোল সুন্দর নহে; কিন্তু—

বহু বস্তু যদি অন্য একটি বৃহত্তর বস্তুর অঙ্গ স্বরূপ হইয়া সমগ্রের অখণ্ডত্ব প্রকাশ করে, তবে ঐ সমগ্র বৃহত্তর বস্তুটি সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। শাখা প্রশাখা পত্রাদি লইয়া একটি বটবৃক্ষ সমগ্র-ভাবে পূর্ণ বৃক্ষ রূপেই সুন্দর।

এমনকি একটি কুৎসিৎ বস্তুও যদি কোন সুন্দর বস্তুর অঙ্গীভূত হইয়া সমগ্রের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেই কুৎসিত বস্তুর কদর্যতাও দূর হইয়া যায়। একটি ভগ্ন মন্দির একাকী অসুন্দর বটে কিন্তু বনের দৃশ্যের মধ্যে এই ভগ্ন মন্দিরের কদর্যতা দূর হয়। একটি বিচ্ছিন্ন সাঁওতাল হয়ত কুৎসিত হইতে পারে, কিন্তু সাঁওতাল-মণ্ডলীর নৃত্যচক্রের মধ্যে তা শ্রীহীনতা দূর হয়। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে রবী নাথ দেখাইয়াছেন বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাঙের ক কর্কশ কিন্তু বর্ষার ধারাপতন-ধ্বনির ঐকতা মধ্যে এই ডাক চমৎকার। এই প্রকার কদর্য দূরীকরণের মূলে রহিয়াছে মানসিক সমগ্র বা পূর্ণতা-বোধ।

একটি বস্তুর অন্তর্গত বহু অঙ্গকে কিংবা এ অবস্থিত বস্তু সমূহকে সংস্থানের দিক পরস্পরের সম্বন্ধে তিন ভাগে ভাগ করা চল 'সম', 'অ-সম' এবং 'বি-ষম'। পূর্ণ সাদৃশ্যে 'স ঈষৎ পার্থক্যে অ-সম এবং অতিশয় পার্থ 'বি-ষম' বুঝিতে হইবে।

যে নিয়ম বা ধর্ম শৃঙ্খলের ন্যায় সম, অ- বি-ষম সকল প্রকার অঙ্গকে বা বস্তুকে নি লক্ষ্যাভিমুখী করিয়া সংহত অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ ক তাহার নাম শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার ফলেই হয় সংহ শৃঙ্খলাই উপায়, সংহতি লক্ষ্য। এই শৃঙ্খ হইতেছে বস্তুর পূর্ণতা সূচক বৈশিষ্ট্য এবং ই সৌন্দর্যের মনোধর্মী উপাদান।

সুন্দর হইতে গেলে কোন বস্তুকে শুধু অঙ্গ প্রতঙ্গ যুক্ত হইলেই চলে না, যদি ঐ প্রতঙ্গ গুলির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রকাশ পায়, ত বস্তুটি সুন্দর হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা চলে সৌন্দর্য অঙ্গগত শৃঙ্খলাসাপেক্ষ।

জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা আসিলে তাহা সু ব্যূহে পরিণত হয়। হট্টগোলের মধ্যে শৃ আসিলে তাহা ঐকতান হইয়া উঠে।

[সুন্দর বস্তুতে শৃঙ্খলা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু শৃঙ্খলা থাকিলেই বস্তু সুন্দর হয় না। যে কোন প্রাণী বা বৃক্ষ একাধিক অঙ্গ যুক্ত পূর্ণ সত্তা ইহাদের অঙ্গগুলি শৃঙ্খলার সহিত কর্ম করিয়া প্রাণধর্মকে অব্যাহত রাখে; কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন প্রাণী বা গাছ সুন্দর নহে, ইহাদের সুন্দর অসুন্দরের ভেদ আছে। সিংহ বা হরিণ সুন্দর, উট বা জিরাফ কুৎসিত, ময়ূর বা রাজহংস সুন্দর, শকুন বা হাড়গিলা পাখী অসুন্দর, বকুল বা বটগাছ সুন্দর, বাঁশ বা খেজুর গাছ কুৎসিত। অর্থাৎ কেবল প্রাণধর্মী ও মনোধর্মী উপাদানেই সৌন্দর্য গঠিত হয় না, তৃতীয় উপাদানও আছে।]

অঙ্গ সামঞ্জস্যই সৌন্দর্যের দেহধর্মী উপাদান। সম ও অ- সমের পরস্পর মিলনের (Agreement) নাম সামঞ্জস্য। অঙ্গগুলির পরস্পর বি-ষমতা না থাকিলে তবেই অঙ্গ-সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

আমাদের দেহ সমপ্রকার স্নায়বিক অনুভূতিতে অভ্যস্ত। অ-সম প্রকার অনুভূতিও দেহ অল্পে অল্পে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু বি-সম প্রকার অনুভূতি বা স্নায়বিক বিক্ষোভ দেহের পক্ষে কষ্টদায়ক। ইহাই দেহ ধর্ম।

আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, ধমনী স্পন্দন 'সম' তালে হয়, চলিবার সময়ে পদক্ষেপেও সমতাল বজায় থাকে। সম-প্রকার স্নায়বিক বোধের পৌনঃপুনিকতায় মানবদেহ অভ্যস্ত এবং অভ্যস্ত ভঙ্গিই দেহের পক্ষে সহজ ও আরামদায়ক। কাজেই উপভোগ্য রূপ বা ধ্বনি প্রবাহের অঙ্গগুলি যদি পরস্পর সম আকারের হয় তাহা হইলে চক্ষুতে বা কর্ণে বিশেষ প্রকার স্নায়বিক বোধের পুনরাবৃত্তিই ঘটে। এই পুনরাবৃত্তি দেহযন্ত্রের অভ্যস্ত ভঙ্গি বলিয়াই ইহাতে ভোক্তা দেহ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে এবং উপভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে তাহার মনে সৌন্দর্য বোধ জন্মায়।

অপর পক্ষে দেহ অবস্থার দাস, এবং জগৎ পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময়। জগতের অ-সমতা ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে বাধ্য হয়; কিন্তু দেহের শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া দেহ ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া 'অ-সম' স্নায়বিক প্রবাহ গ্রহণ করিতে পারে, তবে হঠাৎ পারে না। হঠাৎ গ্রহণের সংঘাত অথবা 'বি-ষম' স্নায়বিক প্রবাহের বিক্ষোভ দেহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ কারক এবং যন্ত্রণাদায়ক। সেইজন্য আমাদের চক্ষু বা কর্ণ উপভোগ্য বস্তুর অঙ্গ সমূহের সমতায় ও অ-সমতায় সুখভোগ করিতে পারে কিন্তু বি-ষমতায় কষ্ট পায়।

মোটর গাড়ীর সমান গতিবেগ ভ্রমণকারী আরোহীর পক্ষে সুখকর, এমনকি অল্প অল্প বেগবৃদ্ধি বা বেগ-হ্রাসও সহনীয় বা সুখকর কিন্তু অতিরিক্ত বেগবৃদ্ধি বা বেগ-হ্রাস অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক।

অতএব সুন্দর হইতে গেলে বস্তু বা বিষয়ের কেবল অঙ্গ-বহুত্ব ও অঙ্গ-সংহতি বা শৃঙ্খলা থাকাই যথেষ্ট নহে, ভোক্তার চক্ষুতে বা কর্ণে যাহাতে স্নায়বিক বিক্ষোভ না হয়, সেই প্রকার গঠন বিশিষ্ট হওয়াও আবশ্যক, পরপর অঙ্গগুলির অনুসরণে চক্ষুতে কর্ণে কেবল সমপ্রকার স্নায়বিক বোধ অথবা ঈষৎ পরিবর্তিত স্নায়বিক বোধ

উৎপন্ন হইলে তবেই চক্ষু বা কর্ণ তৃপ্ত হয় এবং বস্তুকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। নচেৎ বি-ষম অঙ্গের অনুসরণে চক্ষু বা কর্ণ স্নায়বিক বিক্ষোভ অনুভব করে এবং বস্তুকে কুৎসিত বলিয়া মনে হয়।

ছন্দঃ শাস্ত্রে প্রাণিসৌন্দর্য নহে, বস্তুসৌন্দর্যই প্রাসঙ্গিক, কারণ ছন্দ বস্তুসৌন্দর্য জাতীয়। বস্তু সৌন্দর্য ও প্রাণি সৌন্দর্যে ভেদ আছে। বস্তু সৌন্দর্য সরল কিন্তু প্রাণি সৌন্দর্য জটিল। প্রাণি দেহের সৌন্দর্যভোগে ভোক্তার চক্ষুক্রিয়ার সহিত মনঃক্রিয়াও যুক্ত হয় ও সৌন্দর্য বিচারে মন অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠে। বস্তু সৌন্দর্য ভোগে মন ক্রমিক অঙ্গগুলির কেবল রেখাগত (Lineal)সামঞ্জস্য নির্ণয় করে, কিন্তু প্রাণিসৌন্দর্য ভোগে উহা পৃথক পৃথক অঙ্গের সহিত মূল দেহের এবং প্রত্যঙ্গের সহিত অঙ্গের আয়তনগত (Volumetric) সামঞ্জস্যও বিচার করে। কেবল বাহিরের রেখায় রেখায় মিলন নহে, পা, মাথা, গলা প্রভৃতি অঙ্গ এবং নাক, চোখ, আঙুল প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ যথাক্রমে দেহ ও অঙ্গের সহিত উচ্চতায়, স্থূলতায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মানানসই কিনা তাহারও বিচার হয়। ভোক্তা তাহার সংস্কারজাত একটা সাধারণ আদর্শের মানদণ্ডে এই বিচার করে; আদর্শের সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমতা বা অ-সমতা থাকিলে প্রাণীকে সুন্দর এবং বি-ষমতা থাকিলে কুৎসিত বলিয়া মনে করে। এইজন্যই হরিণ সুন্দর, জিরাফ কুৎসিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। লম্বা কান ছাগলের পক্ষে সুন্দর কিন্তু বাঘের পক্ষে কুৎসিত। এক্ষেত্রে আমাদের অভ্যাসজ সংস্কার সাধারণ রূপ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। আবার মনুষ্যসৌন্দর্য নির্ণয়ে আরও অধিকতর জটিলতা সৃষ্টি হয়—জাতিগত সংস্কার, স্বজাতি-প্রিয়তা যৌনবাসনা প্রভৃতি মনোবৃত্তি সাধারণ রূপদৃষ্টিকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করে। সেইজন্য চেপ্টা নাক কেবল চীনাদের কাছে, স্থূল ওষ্ঠাধর কেবল কাফ্রী নিগ্রোর কাছে সুন্দর বলিয়া বোধ হয় অথচ অন্য জাতির কাছে কুৎসিত ঠেকে। মনুষ্যসৌন্দর্য ভোক্তার মানে জটিলতা সৃষ্টি করে বলিয়া উহাকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের মধ্যেই গণনা করা উচিত।

ছন্দঃ শাস্ত্রে মনুষ্য সৌন্দর্য বা প্রাণিসৌন্দর্যের আলোচনা নিস্প্রয়োজন, বস্তু বা বিষয়ের সৌন্দর্য সৌন্দর্যতত্ত্বে আলোচ্য।

সামঞ্জস্য দ্বিবিধ-- সঙ্গতি ও সম্মিতি। বস্তু বা বিষয়ের সম ও অ-সম অঙ্গগত সমাঞ্জস্যের নাম—সঙ্গতি। বি-ষম অঙ্গগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা থাকিতে পারে, সঙ্গতি থাকিতে পারে না। পর্বতের শিখরমালায়, মেঘের গঠনে, উৎস জলের উচ্ছ্বাসে, ধূমের গতিপথে, নদীর গতিতে, মাছের সাঁতারে, রাগরাগিনীর আলাপে দেখা যায়—সঙ্গতি। দৃষ্টান্ত গুলির অঙ্গে অঙ্গে অ-সমতা থাকিলেও বি-ষমতা থাকে না; সেই জন্যই এই গুলির মিলন সম্ভব হয় এবং সেই মিলনে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। অতএব—সৌন্দর্য সঙ্গতি-সাপেক্ষ।

'সম' অঙ্গ সমূহের সামঞ্জস্যের নাম—সম্মিতি। সঙ্গতি ও সম্মিতি পরস্পর বিরোধী নহে, সাধারণ ক্ষেত্রের সঙ্গতিই বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মিতি হইয়া উঠে।

বিল্বপত্রের গঠনে, মন্দিরের বা মসজিদের আকারে, ঘড়ির দোলকে, সাপের গমনে, ঝুলন দোলায়, ময়ূরের নাচে, নিতম্বিনীর চলনে, তাল-মান-লয় যুক্ত সঙ্গীতে দেখা যায় —সম্মিতি।

আসলে ত্রিপত্র-বেলপাতার কেন্দ্রস্থ পত্রের দুই পাশে অবস্থিত পত্রদ্বয়ের সমান আকৃতি, মন্দির বা মসজিদের মেরুদণ্ড রেখার (Axis) উভয় পার্শ্বে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত সমরেখায় ভারসাম্য, ঘড়ির দোলকে ও ঝুলন দোলায় কেন্দ্র হইতে যথাক্রমে ডাহিনে, বামে বা সম্মুখে পশ্চাতে দোলনের সম দৈর্ঘ্য, ময়ূরের নাচে ও নিতম্বিনীর চলনে উভয় পার্শ্বের সম প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন এবং তালমানলয়যুক্ত সঙ্গীতে সমতাল আমাদের সম্মিতি বোধ উৎপন্ন করে, এবং সেইজন্য এই গুলি সুন্দর বলিয়া গণ্য।

সংক্ষেপে সৌন্দর্যের লক্ষণ— (১) অঙ্গ বহুত্ব, (২) অঙ্গ সংহতি ও (৩) অঙ্গ সঙ্গতি বা সম্মিতি।

এই তিনটির একটিরও অভাব ঘটিলে সৌন্দর্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ—

সুন্দর হইতে গেলে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ বা শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনিকে সুসঙ্গত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত, শৃঙ্খলা সমন্বিত ও সম্পূর্ণ হইতে হইবে।

---

* 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রী ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'ছন্দোবিজ্ঞানের' (দ্বিতীয় সংস্করণ) দ্বিতীয় অধ্যায় রূপে পরিকল্পিত।

—সম্পাদক।

আমি আজ

রমাপ্রসাদ দে (প্রাক্তন ছাত্র)

পদ্মা
স্বচ্ছন্দ ইচ্ছায় ধীরে প্রতিভাত হ'ল।
তীরে রোদে একাকী বালক
সকালী হাওয়ায় হাঁটে—
একাকী অবাক,
দূরে জলে—জলের আকাশে দেখে
পাখির মতন যেন নৌকা একঝাঁক।

গান-গাওয়া
পাখি ডাকে—
গুন্ গুন্ উল্লসিত হাওয়া।

ঘরমুখো বালকের মন
যেতে-যেতে দাঁড়ায় কখনো ;
মুঠো ভরে অকারণ
সব্জীর ক্ষেত থেকে তুলে নেয়
পুরোনো দিনের স্মৃতি : সমস্ত আকাশ ;
শুধু একমাত্র বৃক্ষ সে-ও আকাশের ওপারে এখনো।
এই ছবি—আমার বুকের মধ্যে
রক্তের মধ্যে জেগে-থাকা একমাত্র ছবি
আজো দেখি দূর
দেখেছি দূরের থেকে নিজে—
সে বালক : আমার হারানো আমি,
আমি আজ গঙ্গার ব্রীজে॥

অন্তর গভীরে কান্না

তপন মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ, পদার্থ বিজ্ঞান

সমুদ্র-সম্ভবা মনে বেদনার স্বপ্ন কল্পনায়
আমি এখন রক্তলাল সূর্যের দিকে চাইবো জীবনসুধায়,
প্রায়শ্চিত্ত করব' নষ্টনীড় মানুষের হয়ে
এই শতকের মধ্যাহ্নতপ্ত ভয়াল শ্মশানে বসে
সভ্যতার চিতার আগুনে
অন্তরের লালাভ শিখায় আর জিঘাংসার ধোঁয়ার
জ্বলনে

বনের গাম্ভীর্যে রক্তঝরা হরিণ হৃদয়ে,
আমি আমার রক্তলাল সূর্যের দিকে চাইব
অকুল বিস্ময়ে—:
—না—না—রাফেলের ইজেলের তলায় দাঁড়িয়ে
ম্যাডোনাকে কোন কাঁদতে দেব না অন্ধ রিষ্টি ক্ষয়ে
অনিকেত হাহাকার দ্বিধা-গ্লানি, ঈর্ষা ভয়
নিয়ে যাব ডানার বাঁধনে
কোন দূর ভারতসমুদ্র কিংবা ভূমধ্যসাগর পথে
অথবা কোন আল্পসের গুহার গহনে।

হৃদয় পাঁজরে অসহ্য জ্বালার জ্বলনে
হায় রে সোনালী সূর্য! এলে না মুমূর্ষু জীবনে
মরুদ্যান মত ; আমার কবরের পরে তাই
একটা-দুটো-অজুরাণ
ঝরাবে ফুল হিন্দু-মুসলমান, জৈন-খৃষ্টান
আরণ্যক মনের প্রাগৈতিহাসিক সরলতায়
অথবা পূর্বাহ্নের নষ্টনীড় মানুষের ব্যাথাদগ্ধ চেতনায় ;
তারপরে স্মৃতিস্তম্ভ পরে লিখে যাবে আমারই নাম
আমার কবরের পরে রেখে যাবে কিছু কিছু হৃদয়
প্রণাম।

———

স্মৃতি মন্থন

"রাত্রিবেলায় শয্যা 'পরে শুয়ে,
ঘুমে আঁখি জড়িয়ে যখন আসে,
অতীত দিনের করুণ স্মৃতি যত
একে একে চোখের 'পরে ভাসে।"

ইংরেজ কবি টমাস মুরের একটি কবিতার প্রথম চার লাইনের এই রকম স্বচ্ছন্দানুবাদ করেছিলাম। মূল ইংরেজী লাইন চারটি এই :

"Oft in the stilly night
Ere slumber's chain has bound me
Fond Memory brings the light
Of other days around me."

তখন বয়স কম ছিল (চোদ্দ কি পনেরো), অনুবাদ ভাল হল কি মন্দ হল তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। এবং কবির কথাগুলো যে ভবিষ্যতে আমার জীবনেও সত্য হয়ে উঠবে, তাও ভাবতে পারি নি।

তখন আমার অতীত ছিল অল্প, মনের আসরে ছিল বর্তমানের প্রাধান্য। তারপর অনেক বছর চলে গেছে ; জীবনে এখন ভবিষ্যৎ কম, অতীত বেশী, তাই পিছন পানে তাকিয়ে স্মৃতি-মন্থন ভাল লাগে।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এক ফালি নিঃসঙ্গ মেঘের মত বেড়াতে বেড়াতে একদিন মুগ্ধ চোখে দেখেছিলেন সোনালী রঙের অগুনতি ড্যাফোডিল ফুল মৃদু মলয়ে মাথা দোলাচ্ছে। তখন তিনি বুঝতে পারেন নি সেই সুন্দর দৃশ্যটি তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে কি অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল :

—অ. কু. ব.

"I gazed, and gazed but little thought
What wealth the show to me had brou

তারপর তিনি অনেক সময় নিরালায় চুপ
যখন আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে ঘরে
থাকতেন, মনকে বল্গামুক্ত করে দিয়ে, (
vacant or in pensive mood"), তখন স্মৃ
চোখে দেখতে পেতেন সেই সোনালী ড্যা
ডিলের নৃত্য, তাঁর মনও নেচে উঠত সেই নৃ
তালে তালে।

জীবনের পথে আমরা এইভাবে অসংখ্য স্মৃ
সঞ্চয় করতে করতে এগিয়ে চলি, ভবিষ্যতে এ
হয় স্মৃতি মন্থনের খোরাক।

১৯২৪ সালের কথা মনে পড়ছে। ত
কলকাতায় মেট্রোপোলিটান ইন্‌স্টিটিউশ
(বিদ্যাসাগর কলেজ সংলগ্ন স্কুল) ষষ্ঠ শ্রেণীতে প
ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার তখনো পাঁচ বছর বা
বাংলা মাসিকপত্র 'প্রবাসী'-র তখন গৌরবময় যু
বাড়িতে প্রবাসী আসত ; পাতা উলটে ছ
দেখতে আর গদ্য পদ্য রচনা গুলো বেছে বে
পড়তে খুবই ভাল লাগত। যেখানে বুঝতাম
সেখানে না-বোঝার ফাঁক টুকু কল্পনা দিয়ে ভরি
নিতাম।

পরে যিনি বাংলার কবিতা এবং সমালোচ
সাহিত্যে স্বনামধন্য হয়েছিলেন, একদিন সে
মোহিতলাল মজুমদারের একটি বড় কবি
প্রবাসীতে পড়ে মুগ্ধ হলাম। সেই সময়ে অবনী

নাথের আঁকা একটি বহুবর্ণ ছবির ছোট সংস্করণও "প্রবাসী"তে আর্ট পেপারে ছাপা হয়েছিল। ছবিটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে কবিতাটির মিল ছিল। কবিতাটি পড়ে সবটা বুঝিনি, তবু তাতে ভাল লাগার বাধা হয় নি। এর আগে আমিও কিছু কবিতা লিখেছিলাম, সেটা বোধ হয় বলে রাখা দরকার।

আমার বানানো সর্বপ্রথম কবিতায় ছিল মাত্র চারটি লাইন :

"আমার বাগানে ফুটেছে কত ফুল,
জল দেওয়া হয় নাই, হয়ে গেছে ভুল।
ওরে ব্যাটা, বাগানেতে রোজ জল দিস ;
মনে করে ছাখ্, ব্যাটা কত করে নিস্।"

কবিতা-রত্নটি মুখে মুখে বানানো হয়েছিল ১৯২০ সালে। তারপর বহুবার কবিতাটি আউড়েছি মুখে মুখে আর মনে মনে। কিন্তু বহু বছর পরে স্মৃতি-মন্থন করতে বসে আজই প্রথম লিপিবদ্ধ করলাম।

কবিতাটির প্রাথমিক প্রেরণা যুগিয়েছিল টবে রক্ষিত কয়েকটি ফুলগাছ। সেইগুলোকে আমি আমার ফুল-বাগান বলে কল্পনা করে নিয়েছিলাম। টবের মাটিতে জল দিতে মাঝে মাঝে ভুলে যেতাম। সেই ভুলের অপরাধটা মনে মনে চাপিয়ে দিলাম একটি কাল্পনিক মালীর ওপর। মনে হল মালীটা মাসে মাসে আমার কাছ থেকে ভালো মাইনে নিচ্ছে, তবু বাগানে রোজ জল দিচ্ছে না, অতএব একটু ধমকে দেওয়া দরকার।

মালীকে ধমকে দেবার জন্যই মুখে মুখে কবিতাটি বানিয়ে ফেললাম। 'ব্যাটা'-কে মনে করিয়ে দিলাম তাকে যখন ভাল মাইনে দিচ্ছি, তখন বাগানে সে রোজ ঠিক মতো জল দেবে না কেন ?

এর পরে তিন চার বছরের ভেতর আরো কয়েকটি ছোট কবিতা (দৈর্ঘ্যে দু-লাইন থেকে চার লাইন পর্যন্ত) বানিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সবাই বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেছে।

সুতরাং প্রবাসীর পৃষ্ঠায় একটি 'অপ্রকাশিত নাবালক কবি আবিষ্কার করল একজন সাবালক কবিকে, যাঁর কবিতা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে।

অবশ্য প্রবাসীতে ছাপা মোহিতলালের কবিতা যে আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল তার একটি ব্যক্তিগত কারণও ছিল। তিনি তখন মেট্রোপোলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে বাংলার শিক্ষক ; আমাদের ক্লাসে বাংলা কবিতা পড়াতেন "পদ্য-পাঠ" নামক একটি রোগা বই থেকে। আজও ভেবে অদ্ভুত কৌতুক বোধ করি "বিস্মরণী", "স্মর-গরল", "স্বপন-পসারী"র বিখ্যাত কবি মোহিতলাল স্কুলে নীচু ক্লাসে আমাদের পড়িয়েছিলেন অনতি-খ্যাত কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'উট' সম্বন্ধীয় পদ্য। শুধু প্রথম লাইন দুটি মনে আছে :

"কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ সারি সারি উট
চালকের ইঙ্গিতমাত্রেই দেয় ছুট।"

ক্লাসে তাঁর কাছে এই পদ্য পড়বার পর প্রবাসীতে তাঁর কবিতা পড়ে কবিতাটি ভালো বুঝতে না পারলেও এইটে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যদুগোপালের চাইতে মোহিতলাল ভালো কবি,

যদিও তাঁকে ক্লাসে যদুগোপালের পদ্য পড়াতে হয়।

১৯২৪ সালের পর আমাকে কলকাতা ছেড়ে ঢাকা শহরে চলে যেতে হল এবং সেখানেই স্কুলে ভর্তি হতে হল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মোহিত-লালকে তাঁর কবি-প্রতিভাকে সম্মান দিয়েছিল তাঁকে সেখানে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে নিয়ে গিয়ে। অবশ্য এর সঙ্গে আমার ঢাকা চলে গিয়ে সেখানকার স্কুলে ভর্তি হওয়ার কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

১৯২৫ সালে একটি আশ্চর্য মানুষ দেখেছিলাম। একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র।

তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। একদিন টিফিনের ঘণ্টায় দেখলাম স্কুল গেটের বাইরে রাস্তায় একটি লোক এমনভাবে এদিক থেকে ওদিকে আর ওদিক থেকে এদিকে পায়চারি করছে যেন সে রাস্তাটার মালিক, এবং তার সেই মালিকানাটাই সে ঐভাবে জাহির করতে চাইছে। তার পরনে বিচিত্র, ছিন্নভিন্ন, মলিন বেশ, এক কালি কাপড় মাথায় জড়িয়ে বাঁধা, মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে আর ডান হাত তুলে তর্জনী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে চীৎকার করে বলছে :

"সম্ভব অসম্ভব হবে।
অসম্ভব সম্ভব হবে।"

এ যেন বিশ্ববাসীর কাছে তার বিশেষ ঘোষণা।

কেউ তার কাণ্ড দেখে আর কথা শুনে হাসল কেউ বলল "পাগল"। এই ধরনের অ-সাধারণ মানুষকে লোকে পাগলই ভেবে থাকে, আমিও হয়তো তাই ভেবেছিলাম।

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। ক্লাসে ফিরে গেলাম কিন্তু কানের পাশে গুঞ্জন করতে লাগল লোকটির সেই বাণী।

কয়েকদিন পর লোকটির দেখা আবার পেয়েছিলাম, আমাদের পাড়ার রাস্তায়। তার মুখে অন্য কোনো কথা নেই, কোনো প্রশ্নের জবাব সে দেয় না, শুধু এক হাতের তর্জনী হাওয়ায় ঘুরিয়ে আর অন্য হাতে নিজের বুকে চাপড় মেরে শুধু বলে :

"সম্ভব অসম্ভব হবে।
অসম্ভব সম্ভব হবে।"

সেদিন তাকে হয়তো পাগল ভেবেছিলাম। আজ মনে হয় সে ছিল সত্যদ্রষ্টা, 'প্রফেট'।

আলোকের এই ঝর্ণা ধারায়

অধ্যাপক শ্রীকিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

আমাদের পাড়ার ছেলেরা এবার সরস্বতী পূজোর সময়, কি করে বা কি কৌশলে জানি না, হঠাৎ অনেক টাকা চাঁদা তুলে ফেলল। চাঁদার পরিমাণ শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কারণ ঠিক চৌমাথার মোড়ের উপরেই আমার বাড়ী আর বাড়ীর ঠিক সামনেই প্রায় মুখোমুখি বললেই চলে,—ছোট্ট একটা রেলিংঘেরা পার্কে পূজোর প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছিল। এতগুলি কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে ছেলেরা যে মাইকের গান চালিয়ে কি প্রলয় কাণ্ড বাধাবে তাই অনুমান করেই আমার এই আতঙ্ক। শুধু পূজোর দিনটিই নয়, আজকাল আবার প্রতিমা নিরঞ্জন উৎসবটিকে দু'দিন-তিন-দিন-এমন কি এক সপ্তাহ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া চলে এবং হামেশাই তা করা হয়। সুতরাং আতঙ্কটা অস্বাভাবিক নয়।

আমার সেই আতঙ্কের কথা হয় তো একটু প্রকাশই করে ফেলেছিলাম, একটি মাতব্বর গোছের ছেলে অভয় দিয়ে বলল "না স্যর, আমরাও ঠিক করেছি এবার আর মাইকের মধ্যে যাব না, তার বদলে প্যাণ্ডেল আর সামনের এই রাস্তা আলো দিয়ে ভাসিয়ে দেব। অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে—তিন হাত পর পরই একটা করে নিওন লাইট বসবে। হাজার হাজার নিওন লাইটের ঝাড়। দেখবেন স্যর, দিন না রাত টেরই পাবেন না তখন।"

ছেলেটির চোখে-মুখে যে আত্মতৃপ্তির ভাব দেখলাম তাতে তাকে দমিয়ে দিতে কেমন মায়া হল। অথচ ভিতরে ভিতরে মাস্টারোচিত কর্তব্যের একটা দংশনও অনুভব করছিলাম। শেষ পর্যন্ত শেষেরটাই জয় হল, ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বললাম, "কিসের আলো বললে?"

ছেলেটি আগের মতই সগর্বে বলল "নিওন লাইট স্যর। যা জিনিষ বসাব দেখলে জীবনে ভুলতে পারবেন না।"

"কি রং এর আলো?"

"কি রং এর আবার! সাদা চোখে-জুড়ানো আলো। গাছের গায়ে লাল-নীল-সবুজ বাল্‌ব্ লাগিয়ে সস্তা চটকদার আলো দিয়ে চোখ ভোলানো নয়, দস্তুর মত—" কথা শেষ না করে ছেলেটি আমার ঘরের দেয়ালে আঁটা ফ্লুওরেসেন্ট আলোর টিউবটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঐ তো আপনার ঘরেও তো রয়েছে স্যর! তবে এখানে মাত্র একটা, আমরা বসাব হাজার হাজার।"

"কিন্তু ওটা তো তোমার ঠিক নিওন লাইট্ নয়।"

"নয়? সে কি বলছেন স্যর।"

"ঠিকই বলছি। ওর নাম ফ্লুওরেসেন্ট লাইট। দু'টোর মধ্যে খানিকটা তফাৎ আছে যে, নিওন লাইট দেখবে? এদিকে এস।"— বলে অনতি-দূরের একটা দোকানের সাইন বোর্ডের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সাধারণ সাইন বোর্ড নয়, আলো দিয়ে লেখা একটা সাইন বোর্ড। আবার

সে আলোও সাধারণ আলো নয়,—স্নিগ্ধ অথচ একটা বেশ টকটকে লাল রং এর আলো। অন্ধকার রাত্রে খোলা আকাশের তলে জ্বল জ্বল করছিল সেই রঙ্গিন আলো দিয়ে লেখা সাইন বোর্ডটা। বললাম, "ঐ হচ্ছে আসল নিওন লাইট্। ফ্লুও-রেসেন্ট আলোকে নিওন লাইট বলা উচিত নয়—যদিও শতকরা নব্বই জন লোক বোধ হয় তাই বলে।" তারপর অল্প কথায় দু'টোর তফাৎও বুঝিয়ে দেওয়া গেল তাকে।

ছেলেটির মুখে প্রথমে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপর তা রূপান্তরিত হ'ল খুসীতে। সেই অবাক্ খুসী মুখেই সে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল, সম্ভবতঃ বন্ধুদের জ্ঞানদানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

সত্যি, নিওন লাইট আর ফ্লুওরেসেন্ট লাইট দু'টোই আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একটু একটু করে জড়িয়ে যাচ্ছে। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এদেশে ওদের চল ছিল না বললেই চলে, কিন্তু মাঝের এই ক'টা বছরেই কী পরিবর্ত্তন! আজ যদি কোন পাড়া-গাঁ-থেকে সদ্য-আমদানী দেহাতি লোককে কলকাতার এস্প্ল্যানেড অঞ্চলে সন্ধ্যার পর ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে তার অবস্থাটা কল্পনা করা কঠিন নয়। "চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া" কথাটা বললে হয় তো কিছুই বলা হবে না, বরঞ্চ কবির ভাষায় বলা যেতে পারে লোকটিকে "আলোকের ঐ ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে" দেওয়া হচ্ছে। লাল, নীল, সবুজ, হলদে অসংখ্য রং এর অসংখ্য আলোয় চার দিক্ ছেয়ে আছে। শুধু আলোর রেখা নয়—রঙ্গিন আলোয় আঁকা ছবি! একবার জ্বলছে, একবার নিবছে,—অন্ধকার আকাশের গায়ে রং এর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে যে জ্বল্ জ্বলে আলো—কিন্তু তার দিকে তাকালে চো জ্বালা ধরে না, মনে হয় সে আলোর মধ্যেও যে একটা স্নিগ্ধতা মাখানো রয়েছে। বিজ্ঞাপ যুগ এটা। সে বিজ্ঞাপন যত চটকদার হবে ত তা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর আলোর বিজ্ঞাপনের মত চটকদার আর কি হ পারে? আলো দিয়ে তৈরী নকল বিজলী-প আকাশের গায়ে যন্ বন্ করে ঘুরছে, আলো গি গড়া টি-পট্ থেকে চায়ের মত তরল আলো গড়িয়ে পড়ছে—এ রকম বিজ্ঞাপন তো চো সামনেই দেখছি। রাস্তা-ঘাটেও এখন সাধ বিজলী বাতির (গ্যাস লাইটের যুগ তো হয়ে গেছে বলা চলে। বদলে ফ্লুওরেসেন্ট আ ক্রমেই জায়গা দখল করছে। তেমন করে বস পারলে দিন কি রাত বোঝাই মুশ্কিল।

অথচ সত্যি কথা বলতে কি, ক'জন লে এই আলোর ভিতরকার রহস্য ঠিকমত জানে?

প্রথমে নিওন লাইট দিয়েই সুরু করা যা নিওন লাইটে লেখা কোন বিজ্ঞাপন বা সাইন যদি দিনের আলোয় ভাল করে খুঁটিয়ে দেখা তবে দেখা যাবে আসলে ওগুলো ফাঁপা কাঁ নল দিয়ে তৈরী আঁকাবাঁকা অক্ষর ছাড়া কিছুই না। তা হলে? ফাঁপা নলের ভি থেকে রাত্রে অমন স্নিগ্ধ আলো বেরোয় কি ক

আসলে ঐ নলগুলো ফাঁপা হলেও ফাঁকা ওর ভিতরকার বাতাস বার করে নিয়ে ওখ খুব মৃদু চাপে ভরে দেওয়া হয় এক রকম গ্যা যার নাম নিওন গ্যাস। তবে সব সময় যে নি

গ্যাসই থাকে তা নয়, নিওনের মতই আর কয়েকটা গ্যাস আছে, যাদের বলা যায় নিওনের জাতভাই, যেমন আর্গন, হিলিয়াম, ক্রিপ্‌টন্ বা জেনন্ প্রভৃতি গ্যাস, তাও অনেক সময় ভরে দেওয়া হয়। সময় বিশেষে একাধিক গ্যাস মিশিয়েও ভরে দেওয়া যেতে পারে। তারপর অন্ধকার রাত্রে ঐ গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিলেই সে গ্যাস বিচিত্র আলোকচ্ছটা বার করতে থাকে। এক এক রকম গ্যাসে এক এক রকম রং এর আলো বেরোয়। নিওন গ্যাসে বেরোয় ঈষৎ হলদে, লাল আলো, আর্গনে হাল্কা নীল, ক্রিপ্‌টনে গাঢ় নীল, জেননে নীলাভ সবুজ ইত্যাদি। নিওনের সঙ্গে আর্গন মিশিয়ে দিলেও হাল্কা বেগুনী থেকে নীলাভ এক রকম আলো পাওয়া যেতে পারে। সময় সময় রঙ্গিন কাঁচের নল ব্যবহার করে আরও নতুন নতুন রং পাওয়া যায়। যেমন, কাঁচের নল যদি হাল্কা লাল করে নেওয়া যায় তাহ'লে তার ভিতর নিওন গ্যাস ভরলে টক্‌টকে লাল আলো পাওয়া যাবে। আবার গ্যাসের চাপ ইচ্ছেমত কম-বেশী নিয়ন্ত্রিত করেও একই গ্যাস থেকে বিভিন্ন রং এর আলো পাওয়া যেতে পারে। নিওন গ্যাস দিয়েই প্রথম সুরু হয়েছিল বলে এই আলোকে বলা হয় নিওন লাইট। এখনও অন্যান্য গ্যাসের চেয়ে নিওন গ্যাসই বেশী ব্যবহার করা হয়।

এই নিওন গ্যাস জিনিষটা কি? এটা কিন্তু বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরীতে তৈরী-করা কোন গ্যাস নয়, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের মতই একটি মৌলিক পদার্থ—যাকে ইংরাজীতে বলা হয় এলিমেন্ট্। কিন্তু মৌলিক পদার্থ হলে কি হবে, সাধারণ মৌলিক পদার্থের তুলনায় এর চালচলন একেবারে আলাদা। অন্যান্য প্রায় সব মৌলিক পদার্থ-ই, সুযোগ পেলেই, পছন্দ মত অপর মৌলিক পদার্থদের সঙ্গে মিশে এক একটা যৌগিক পদার্থ—যাকে ইংরেজীতে বলে কম্পাউণ্ড—তৈরী করতে পারে এবং করেও। নিওন কিন্তু ভীষণ একাচোরা। নিজের ব্যক্তিত্ব (?) সম্বন্ধেও হয়তো ভারী সজাগ। তাই সে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে কক্ষনো অপরের সঙ্গে মেলা এর কোষ্ঠীতে লেখেনি। এই জন্যেই রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন নিষ্ক্রিয় বা "ইন্‌অ্যাক্‌টিভ্" গ্যাস। নিওন, আগেই বলেছি, একটা এলিমেন্ট বা মৌলিক পদার্থ তাই ওকে "ইন্‌অ্যাকটিভ্ এলিমেন্ট ও বলা চলে। নিওনের যে চারটি জাত ভাইদের কথা আগে বলেছি—আর্গন, হিলিয়ম, ক্রিপ্‌টন্, জেনন্—তারাও ঠিক এই রকম নিষ্ক্রিয় গ্যাস। সমস্ত রসায়ন জগতে এদের জুড়ি নেই। সম্প্রতি রেডন্ নামে আর একটি নব-আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থও এদের দলে যোগ দিয়েছে—এটি আবার রেনিয়াম-ইউরেনিয়ামের মত তেজস্ক্রিয়ও।

এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির আবিষ্কারের গল্পও বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। কারণ রেডন্ ছাড়া এদের সবগুলিই আমাদের আশপাশে বাতাসের মধ্যেই ছড়িয়েছিল—কেউ তা টের পায় নি।

আমাদের চারদিকে যে বাতাস সর্বদা আমাদের ঘিরে রেখেছে, যাকে আমরা ভাল কথায় বায়ুমণ্ডল বলি তা মোটামুটি চারভাগ নাইট্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন মিশিয়ে তৈরী। অবশ্য এ ছাড়া

আরও ২।৪টে জিনিষ অতি সামান্য পরিমাণে তার সঙ্গে মিশে থাকে। যেমন জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু'শ' বছর আগে ক্যাভেণ্ডিশ্, নামে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী (যিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে জল মৌলিক পদার্থ নয়—অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিলিয়ে তৈরী)একবার বাতাসের নাইট্রোজেন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর মনে হ'ল যে, যে অংশটার সবটাই নাইট্রোজেন বলে তাঁর ধারণা ছিল তার সবটাই যেন নাইট্রোজেন নয়, আর কিছু দিয়ে ঐ নাইট্রোজেনটুকু টেনে নিলেও যেন খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস থেকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য এটুকু লক্ষ্য করা ছাড়া তিনি আর তখন কিছু বলতে পারেন নি। এর প্রায় একশ' বছর পরে লর্ড র‍্যালে নামে আর একজন বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী আবার বাতাস নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। বাতাসে যে গ্যাস যতটা পরিমাণ আছে বলে জানা ছিল র‍্যালে সেই সব গ্যাস ঠিক ঠিক সেই সেই পরিমাণে মিশিয়ে একটা কাচের নলে ভরে নকল উপায়ে বাতাস তৈরী করবার চেষ্টা করছিলেন। এই নকল বাতাসের বিভিন্ন গুণ পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে আসল বাতাস আর তাঁর তৈরী নকল বাতাসের ঘনত্ব অর্থাৎ 'ডেন্‌সিটি' ঠিক এক রকম নয়—সামান্য একটু তফাৎ দাঁড়াচ্ছে। তিনি তখন বাতাস থেকে নাট্রোজেন বার করে নিয়ে সেই নাইট্রোজেনের ঘনত্ব বার করলেন, আর সেই সঙ্গে পরীক্ষাগারে রাসায়নিক উপায়ে তৈরী করা নাইট্রোজেনের ঘনত্বও মাপলেন। দেখা গেল, এক্ষেত্রেও দু'টোর মধ্যে ঐ রকম তফাৎ দেখা যাচ্ছে। র‍্যা তখন মনে পড়ল ক্যাভেণ্ডিশের সেই পরীক্ষ কথা। তিনি বার বার পরীক্ষা করে তাঁর পরীক্ষ ফল যাচাই করে দেখলেন। অবশেষে ধারণা হ'ল নিশ্চয়ই তাহলে বাতাসে শুধু নাই জেন আর অক্সিজেনই নেই, যেমন আছে কা ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি তেমনি হয় আরও কোন নতুন ধরণের অজানা গ্যাস নি আছে অতি সামান্য পরিমাণে। কি হতে প সেটা?

তখন লর্ড র‍্যালের সঙ্গে কাজে নামলেন উইলিয়াম্ র‍্যামজে। দুই বিজ্ঞানী মিলে দি রাত্র কাজ করে যেতে লাগলেন পরীক্ষাগা পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ল না। এক দিন ধরা পড়ল—স সত্যি বাতাসের মধ্যে আরও এক রকম অজ গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে মিশে আছে, এই গ্যাসটি এমনি অদ্ভুত যে অন্য কোন মৌ পদার্থের সঙ্গেই মিলে মিশে একত্র হয়ে যৌগিক পদার্থ গড়ে তুলবার ক্ষমতা এর আদ নেই। অর্থাৎ একেবারে যাকে বলে নিষ্ক্রি এ ধরনের কোন নিষ্ক্রিয় পদার্থের কথা এর আ কোন বিজ্ঞানীর জানা ছিল না। তাই আবিষ্কা খুবই বড়দরের হ'ল বলতে হবে। কি নাম দে যায় গ্যাসটার? র‍্যামজে অনেক খুঁজে পে শেষে গ্রীক্ ভাষা থেকে একটা লাগসই নাম করলেন—'আর্গন', মানে 'অলস'।

কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। বাতাসকে তেমন ভাবে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে আর ঠাণ্ডা জলের মত তরল করা যায় এ তথ্য আ

হওয়ার পর র‍্যামজে তরল বাতাস নিয়েও পরীক্ষা করছিলেন। এখন যে সব উপাদান দিয়ে বাতাস তৈরী তার সবগুলি একই উত্তাপে তরল থেকে বাষ্প হয় না। কোনটা খুব কম তাপেই বাষ্পাকারে উড়ে যায়, কোনটার বাষ্প হতে তার তুলনায় আর একটু বেশী তাপ লাগে। নাইট্রোজেন শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ১৯৫ ডিগ্রী নীচে এলেই তরল থেকে বাষ্প হয়ে যায়। কিন্তু অক্সিজেন শূন্য থেকে ১৮২ ডিগ্রী নীচেও তরল থাকতে পারে। র‍্যামজে দেখলেন, তরল আর্গনও শূন্য থেকে ১৮৫'৮৫ ডিগ্রী নীচে এলে তবেই বাষ্পাকারে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং যদি এই তাপ নিয়ন্ত্রণ করে করে তরল বাতাসকে ফুটতে দেওয়া যায় তা হলে ওর ভিতরকার পৃথক্ পৃথক্ উপাদানকে হয়তো সহজেই আলাদা করে ফেলা যেতে পারে। সত্যিই তাই সম্ভব হ'ল। র‍্যামজে এই প্রক্রিয়ায় তরল বাতাস থেকে আর্গন সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করলেন। এই ভাবে তরল বাতাস থেকে আর্গন বার করবার সময় আরও কয়েকটা চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেল। দেখা গেল এতদিন যেটাকে আর্গন বলে মনে করা হ'ত সেটা কিন্তু খাঁটি আর্গন নয়। আর্গনের সঙ্গে সেখানে জড়িয়ে আছে তার আরও চারটি জাতভাই—তারই মত নিষ্ক্রিয় চারটি গ্যাস। এই গ্যাসগুলোরও তখন নতুন নতুন নাম দেওয়া হ'ল। একটার নাম দেওয়া হ'ল 'নিয়ন' অর্থাৎ 'নতুন', একটার নাম 'ক্রিপ্‌টন' অর্থাৎ 'লুকানো', একটার 'জেনন' অর্থাৎ 'অপরিচিত'। বাকি গ্যাসটার নাম দেওয়া হল 'হিলিয়াম্'। সূর্যকে বলা হয় 'হিলিয়স্'। ঐ গ্যাসটা সূর্যের মধ্যে আছে বলে আগে থেকেই সন্দেহ করা হয়েছিল সূর্যের আলো পরীক্ষা করে, তাই এই নাম।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি একটার সঙ্গে আর একটা জড়াজড়ি করে থাকে, তাই এদের একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করা সহজ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানী সে উপায়ও বার করলেন। নারকেলের মালা পুড়িয়ে যে কাঠকয়লা পাওয়া যায় তার কতকগুলি গুণের কথা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। সে গুণটা আর কিছু নয়—বিশেষ অবস্থায় তার গ্যাস পছন্দ-অপছন্দ করার বা আরো ভাল করে বললে, গ্যাস বাছাই করার গুণ। ঐ কাঠ কয়লাকে যদি শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চেয়েও একশ ডিগ্রী নীচেকার উত্তাপে রেখে তার ওপর ঐ নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি চালিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সেই কাঠ কয়লা শুধু আর্গন, ক্রিপ্‌টন আর জেননকে শুষে নেয়, হিলিয়াম আর নিওন পড়ে থাকে। এর পর যদি আবার ঐ রকম কোন কয়লাকে আরও ঠাণ্ডা করে শূন্য ডিগ্রী থেকে ১৮৫ ডিগ্রী নীচেকার উত্তাপে নামিয়ে আনা যায় তা হলে এবারে সে কয়লা কেবলমাত্র নিওন গ্যাসটুকু শুষে নেবে, হিলিয়াম্‌কে শুষবে না। সুতরাং ঐ কাঠ কয়লাকে একটু গরম করলেই তার ভিতরকার সবটুকু নিওন বেরিয়ে আসবে এই-ভাবেই বিজ্ঞানীরা নিওন গ্যাস সংগ্রহ করছেন।

নিওন লাইটের মত ফ্লুওরেসেন্ট লাইটেরও চাহিদা আজকাল ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কাজেই এ সম্বন্ধেও ২/৪ কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। নিওন লাইটের যেমন ফাঁপা নলের মধ্যে থাকে নিওন গ্যাস, ফ্লুওরেসেন্ট লাইটে তেমনি থাকে

পারার বাষ্প বা মার্কারী-ভেপার। নিওন গ্যাস যেমন বিদ্যুত চালানো লাল আলো বার করতে পারে তেমনি এই পারার বাষ্প বা মার্কারী ভেপার বার করতে পারে ঈষৎ নীলচে আলো। তাছাড়া পারার বাষ্প থেকে আলট্রাভায়োলেট রশ্মিও বেরুতে থাকে। কিন্তু ফ্লুওরেসেন্ট টিউবে শুধু ঐ পারার বাষ্পই থাকে না—ঐ টিউবের গায়ে মাখান থাকে কোন একটা ফ্লুওরেসেন্ট পদার্থ। ফ্লুওরেসেন্ট পদার্থ বলা হয় সেই সব জিনিষকে যেগুলি অন্য আলোকরশ্মি থেকে আলো শুষে নিয়ে খানিক পরে নিজেরাই দীপ্তি ছড়াতে পারে। ক্যালসিয়াম ফ্লুওরাইড এই রকম একটি জিনিষ। ও ছাড়া আরও আছে। ফ্লুওরেসেন্ট টিউব জ্বালালে অর্থাৎ তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে তার ভিতরকার পারার বাষ্প আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ছড়াতে থাকে, আর টিউবের গায়ে মাখানো ফ্লুয়োরেসেন্টের প্রলেপ সেই রশ্মি শুষে নিয়ে নিজেরাই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে আমরা ঐ স্নিগ্ধ, প্রায় দিনের আলোর মতই সাদা আলো দেখতে পাই। মোটামুটি ব্যাপারটা এই, তবে এই আলো জ্বালানোর প্রক্রিয়ায় আরও কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে যার বিশদ আলোচনা এখানে অল্প কথায় করা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে সাধারণ বিজলী বাতির আলো আর ফ্লুওরেসেন্ট আলোর পার্থক্য। সাধারণ বিজলী বাতির মধ্যে খানিকটা সূক্ষ্ম বাঁকানো তার থাকে তাকে বলা হয় ফিলামেন্ট। তা ছাড়া ঐ বাতির মধ্যে কোনও বাতাস থাকে না। যখন ঐ বাতির বিদ্যুৎ চালানো হয় তখন ঐ ফিলামেন্ট এত হয়ে ওঠে যে তারই থেকে আলো বেরোতে থা ফলে এ আলোটা হয় ঈষৎ লালচে আর দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তাপও তৈরী হতে থা তার মানে এখানে যে বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হয় সবটা আমরা আলো হিসাবে পাই না—পাই শতকরা ২০ ভাগ, বাকিটার মধ্যে শতকরা ২ ভাগ তৈরী করে অদৃশ্য আলো (যেমন ইনফ্রা রশ্মি) যা আমাদের আলো হিসাবে কোন ক লাগে না। এছাড়া প্রচুর শক্তি চলে ফিলামেন্টকে গরম করতে তাপ হিসা ফ্লুওরেসেন্ট আলোয় কিন্তু তা হয় না। সেখ বিদ্যুৎশক্তির শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ খরচ আলট্রাভায়োলেট রশ্মি তৈরী করতে। কিন্তু রশ্মির প্রায় সবটাই টিউবের প্রলেপ শুষে দীপ্ত হয়ে ওঠে আর আলো ছড়াতে থাকে। ছাড়া ঐ যে নীলচে আলোর কথা বলেছি তাতেও প্রায় শতকরা ২ ভাগ আলো বেড়ে যা বাকি সামান্য শক্তি খরচ হয় তাপ তৈরীর কা সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোড়াতে টিউবের দাম হিসে কিছু বেশী খরচ পড়লেও শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ শ খরচে ওতে লাভ হয় প্রায় তিন গুণ। অ অনেক কম 'ওয়াট্' খরচ করে আমরা অনেক বে আলো পাই। আর যেহেতু ওয়াট্ কম খরচ হ মানেই কম তাপ সৃষ্টি, তাই ফ্লুওরেসেন্ট বা বিজলী বাতির মত অত গরমও হয় না।

ভালোবাসা একটি ফুলের নাম

॥ বিভাস চৌধুরী (প্রাক্তন ছাত্র) ॥

খুব সন্ধে হ'য়ে এলে আমি আর যাবোনা বাহিরে।
এখন বিকেল বেলা। খুব দূরে
অনিঃশেষ উঁচু-নিচু মাঠের ওপারে নিষ্প্রভ আলোর চূড়া দেখা যায়।
অথচ সুদৃশ্য এই ঘরের ভিতরে, কী আশ্চর্য,
কোন পরিচিত যুবকের কণ্ঠস্বর নেই। তবু,
যেন কেউ ফিরে আসবে বলে ভগ্ন সেই বিশাল প্রাসাদে
কোনো-এক ব্যথিত জানালা আজো
খোলা পড়ে আছে।

এত আলো ঘরের ভিতরে।
পুরাতন ওই সিঁড়ির দেয়ালে এ-কার উজ্জ্বল ছবি দোলে!
বাহির বাগানে
সে কি সঙ্গীহীন কোন বলদপা বৃক্ষের স্থিরতা?
ভালোবাসা, বলো, আমি কোন্ পথে যাবো।
উঁচু-নিচু মাঠের ওপারে
আজো কী সে রক্তহীন ফুল ফুটে আছে? কেন এত তীব্র
অভিমান, বলো,
দুঃখ, তুমি বুঝি স্মৃতিবহ উঠোনের অভিমান নিয়ে আসো?

খুব সন্ধে হলে আমি আমি আর যাবোনা বাহিরে।
এখন বিকেল বেলা।
আমার সঙ্গীরা সব যুথনৃত্যে যোগ দিতে গেছে দীর্ঘ এক
গুহার ভিতরে।
চতুর্দিকে তাই কোন পরিচিত কণ্ঠস্বর নেই; কী আশ্চর্য তবু,
এত আলো ঘরের ভিতরে!
কেবল পায়ের শব্দ, কেবল বৃষ্টির শব্দ, আনন্দিত;
যেন জ্যোৎস্নার সুদূর
হীরে-জ্বলা একমাত্র ফুল জনশূন্য বাড়ির উঠোনে; যেন
ঘরের ভিতরে
অবিরল শব্দহীন সন্ধ্যার নূপুর।

কবিতার অভিজ্ঞতা

—অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায় (প্রাক্তন

এ-তো দেখাই যায় বা গেছে মানুষের বসতিতে কবিতায় বিচলিত অধিবাসী কিছু অবিরল নয় প্রায় সমস্ত কালেই। অল্পমাত্র মানুষেরাই এই সব কথা বোঝেন বা বুঝতে চান, কারোই প্রায় তেমন দায় থাকে না। আজ নয় শুধু, কবিতার কথা মানুষের সংসারে বিশেষ শোনা যায়নি কখনোই ; শোনা যায় না, যাবে না সম্ভবত। যদিও প্রেমিকেরা বেদনার্ত, এইটাই তবু খুব স্বাভাবিক। কারণ কিছু কিছু স্থির কবি ও কবিতায় পৃথিবীতে মানুষের বাস অনেকদিন হয়ে গেল বলে আমাদের যে উত্তরাধিকার আছে, তাদের মুখে নিবিড় তাকিয়েও ধারণা ক্রমে দৃঢ় হতে থাকে হয়েছে যে কবিতা অন্যমূল। ধ্বনি নয় প্রতিধ্বনিত, সত্তা নয় প্রতিবিম্বিতর দিকে যেন পাল তুলে অলৌকিক নৌকায় কবিতা অতএব কবিও সংসার থেকে অন্যপন্থ, বাউল। এক অন্য কোথাও উড়ে চলেছে সে বলাকা, অসংলগ্ন অনাসক্ত কবি সোনার সংসারে।

কয়েকটি নির্জন পাঠকেরই নয়, কবিতা ও কবির এ অভিজ্ঞতা স্বয়ং কবিরও এবং সর্বদা। ঐ অসংলগ্নতা, অনাসক্তি ও অধরার মর্মবাঁশি ধ্বনিত করবার চরিত্রবিষয়ে সেইজন্য একজন কবি, কবিতাই যার পক্ষে জীবনসত্য ও সত্যজীবন, যখন কবিতা বা আত্মজীবনী লিখছেন না তখনও অবহিত। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র, কিম্বা ইয়েটস কি কীটস বা লরেন্সের প্রিয়জনকে লিখিত পত্রগুচ্ছ এদিক থেকে বিস্মিত করবার মত। কারণ এরা কবিতা নয় বা নয় জর্নাল পরিচিতেরও জন্য বন্ধ করে' ; আনন্দে বা দুঃখে প্রিয়জনকে নিতান্তই কিছু চিঠি। প্রিয়জনের কাছে মানু যদিও প্রায় অবিশিষ্টহীন ভাবেই অব এবং নিগূঢ়ও তবু সেইসব কথা কবিরা যা চি লিখেছেন অনেক সময়ই, অন্যেরা যদি ক লেখে তা স্বাভাবিকভাবেই তারা বিব্রতজন স্কুলকলেজের ছাত্র বা পত্রিকার সম্পাদকের কা পাঠায় ; চিঠি লিখে জানায় না প্রিয়জনকে। কথা তাদের দিক থেকে যেহেতু প্রিয়জনকে লে মত আন্তরিক সত্য ও দর্পণস্বচ্ছ হয়ে ও অধিকাংশসময়ই। অথচ সেসব কথা যা তা কাছে মুখোসের মত ব্যবহৃত এইসব কবিদের ব এভাবে দেখা যায় এবং সমস্ত কবিরই মুখোস বরং মুখ, স্বভাবের মসৃণ দর্পণ উজ্জ্বল, যা তুলে যায় প্রিয়জনেরই কাছে, কারণ আর কেউই জন্য এমন উন্মুখ প্রতীক্ষা করছেন না। চিঠিগু এই প্রথম দিক যা দেখিয়ে দেয় যে আমাদের সং যা জানাতে চায় অনাত্মীয়কে, একজন কবি চিঠিতে লেখেন প্রিয়জনকেই যেহেতু সো সংসার থেকে কবিরা আছেন অন্যদিকে। দ্বি দিকে তাছে মোটামুটি চিঠিগুলোর অন্ত প্রধানস্তর : টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তি যা নি সংসার তাদের সবচেয়ে বেশি বলে কবিরা করেছেন জীবনের গভীর গুহা থেকে উদ্ভাস সত্য, অন্ধকার সূর্যের দিকে চিত্তের স্বাভা

প্রবাহ। আর এই রকম করে' যখন শুধু কবিতা নয়, যা অনেকেরই ধারনা ঘানিয়ে তোলা, এ রকম সব চিঠিতেও দুদিক থেকেই পড়ে নেওয়া যায় কবিদের অন্তর্নিহিত চরিত্রটি এবং কবিতাও, তখন অনেকটাই দ্বিধাহীন মানতে ইচ্ছে করেছে সেই তাদের অন্য কেন্দ্র, অসংলগ্নতা সংসার অপনয়ন।

তবু আবার থামতে হয়। চোখে না পড়ে' পারে না কবিদের স্বলিখিত ঐ সব নজীরের পরেও কখনো বা পাশাপাশিই, কবিতার ও কবির মৌলস্বভাবে এ সংসার অনাসক্তির অসংলগ্নতার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণের কথাও আছে প্রায় সমপরিমাণেই এবং লিখেছেন কবিরাই। এদেশে কবিজীবনী তেমন সংগৃহীত হয়নি। তবু ব্যাস বাল্মীকির যে জীবনের কথা তাঁদের কাব্যে আছে সেখানে সংসারের রক্তরাগ কিছুমাত্র ম্লান নয় এবং বিদেশের কবি শিল্পীর জীবনে সংসারকে নিয়ে কবিদের আকর্ষণের বিবরণ এদেশের পাঠকের কাছে কখনো পীড়াদায়কও মনে হয়েছে সংরাগের তীব্রতায়। কবির জীবনীতে কবি থাকবেই এমন কিছু স্থির সত্য যদিও নেই তবু কবিতায় তাকে থাকতেই হয় এবং সেই তার যথার্থ জীবন-চরিত। সেক্সপিয়র রবীন্দ্রনাথের লেখা আর যেখানেই না মিলুক কিন্তু সংসার সংরাগের আরক্তিম বিভা বহন করে আনে দুজনেরই কবিতা। এরপর এইদিক থেকে দেশবিদেশে যত কবিতার কথাই স্মরণে আসে সবাই দাঁড়িয়ে এই দুঃখ সুখ মান অভিমান পরিপূর্ণ জীবনের মেলায়, প্রত্যন্তে নয় অভ্যন্তরে; আবর্তিত মথিত তারা সংসারের তলহীন গম্ভীরায়। কবি যত বড় ততই প্রবেশ করেছেন আরও গহনে এবং কালেকালে দেশে-দেশে সংসার সীমায় কবিতার স্বাধিকার বেড়েছে এতই যেখানে সাম্প্রতিককালে এমন কথা অল্পই মনে পড়ে যা কবিতায় আসেনি বা আসে না।

নিশ্বসিত জীবনবিভার এ দুরন্ত স্মৃতির পরেও কোথায় যেন মনে হয় কবিতার ও কবিদের এ সংসার সংরাগ সংসারে তবু চোখে পড়ে না, সেইই বুঝিবা কখনোই। পরিচিত আমাদেরই তটে বা উঠানে, কখনো বা ভাসিয়ে ঘর প্রবাহিত থেকে কখোন কি করে কবিতা যায় তাকে পার হয়ে পায়ে পায়ে চোখেই পড়েনা যদিও, যখন স্থির হলো যবনিকা একথা নিয়েই ফেরে পাঠক যে কবিতা নয় আত্মীয়, প্রতিবেশীমাত্র। প্রতিরূপ হয়না কবিতা সংসার সংরাগে। জীবনের সীমায় যা আসে আর যা যায় তাকে চেনা হয় অন্যেরই চোখে, অন্যেরই জানায় নেনে নিয়ে পাঁচজন সামাজিক পারিবারিক. নিজেই চেনবার চলবার দায় কে নেয় আর, নেয় কজন নিতেই বা পারে এমনি করে' শেষে কিছু জানা এবং অনেকটাই না জেনে, না চিনে নিজেকেও, অবসর কই অভ্যাস নেই, সমস্ত সংসারটাই চলে চলেছে অন্ধ যেন নিশিনিশিরুদ্ধঘরে ধূমাঙ্কিত শিখার অন্ধকারে: সেখানে সময় মৃত, কিছুই ঘটেনা, বেগহীন নিশ্চলতা। অথচ সেই সোনার সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে কবিতামাত্রই উদ্‌ভ্রান্ত ঘটনা।

দেখো দেখো নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ
কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—

স্তব্ধছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা—আশ্চর্য পুলকে
পুরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে,

মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলোয় শান্ত আকাশ ও বৃহৎ লোকালয়ের ছবিটি সংসারে যদিও বা চোখে পড়ে অধিকাংশের চেতনায় সেখানে তা স্থাণু, চিত্রার্পিত। সেখানে এ দিব্য উৎসারেও আমাদের কাছে কিছু ঘটেনা বা যেটুকুও ঘটে এবং তাতে জ্যোৎস্নায় স্নান করে' সংসারের যে রূপ চেতনাকে স্পর্শ করে এবং সেখান থেকে আবার ঐ জ্যোৎস্নাকে তা এতই ম্রিয়মাণ যে জানতেই পারি না আমরা স্পষ্টতায় আবরণ সরিয়ে, জানানোর কথাতো ওঠেই না যেমন এ কবিতাংশে কবি ঘটিয়ে তুলেছেন সম্পূর্ণ একটি ঘটনাই বিবরণ পার হয়ে বিবরণে যুক্ত করে এই কথা—

এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—

এইখানে মগ্ন হলে' যেহেতু এইখানেই এ কবিতার কেন্দ্র দেখা যাবে যে এ কবিতার পরিচয় আর এখন এটুকু বললে হচ্ছে না যে এ হলো জ্যোৎস্নার কথা বা কবিতাটির বিষয় জোৎস্না। একেবারেই নয়। মনে হয় কম বা অন্য কথা বলা হলো, হলোই না বলা। এই কবিতার পর কবিতাটি থেকে আর পৃথক করা চলেনা জ্যোৎস্নাকে, কারণ এইখানেই চাঁদ স্নিগ্ধ আলোতে, কবিতাটিই সেই বিশেষ ছুঁতে পারা যায় যেন জ্যোৎস্না হয়ে ছড়ালো আলো প্রশান্তি এবং বুকভরা উদার মমতা। এবং শেষের ব্যাপারটি (কবিতা ছাড়া ঘটানো প্রায় অসম্ভব জানতে পারলে কবিতার পাঠকের ও নায়িকার যেমন) বলতে ইচ্ছে করবে,—

আশ্চর্য পুলকে
পুরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে,
কোথা হতে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে

এবং এইরকমই হয়ে থাকে বিষয় বিষয়ীর ভাঙা গড়ায় পুন নির্ম্মাণে একটি ঘটনার অভিঘাতে যারপর তারা জানায় ও জানে নিজেদেরই আবে সত্য করে'। এইজন্যই কবিতার চাঁদকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না যেহেতু ছায়ার মত বিবরণে ন কবিতায় সবকিছু উপস্থিত ঘটনাগতভাবেই সৌন্দর্যের মধ্যে প্রকৃতই মগ্নহবার অভ্যাস যা আয়ত্ত সে যেমন একই দৃশ্যে বারবার পুলকিত হ তার তল খুঁজে পায় না, কারণ প্রতিবারই দৃশ্য উপস্থিত গভীরতর স্পর্শসহ সত্তায়, কবিতা যেহেতু সর্ব্বদাই ঘটনা পুনরাবৃত্তি অনেকে একঘেয়ে লাগলেও কবির ও কবিতার পাঠকে তা' সেজন্যেই লাগেনা (তাছাড়া শেষ পর্য পুনরাবৃত্তি কখনোই সম্ভব নয়) কারণ এক কথা হয়তো, তবু কবিতায় আবার তা বলতে গি আবার রঙ ফেরে, পরিবর্তিত হয় কণ্ঠস্বর সম চাপটাই বদলে যায় আশ্চর্য রকম। যেমন ঘটে য আগের কবিতাটির পাশে মনে করা যায়ঃ

স্পন্দিত নদীজল ঝিলিমিলি করে,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি বালুকার চরে।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা, কাণ্ডারী জাগে,
পূর্ণিমারাত্রির মত্ততা লাগে।
খেয়াঘাটে ওঠে গান অশ্বত্থ তলে,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি আনমনে চলে
ধায় সে বংশীরব বহুদূর গাঁয়,
জনহীন প্রান্তর পার হয়ে যায়।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের উত্তরোল প্রগলভতা ক্ষান্ত হয়ে জাগে প্রথমদিনের সূর্যের গম্ভীর প্রশান্তি ধ্রুপদী সত্তার রহস্যজড়িত চেতনার অনুসূত্র যদিচ উভয়তই বা যেমন রঙ ফিরলো, ধ্বনিও, শ্বাসরুদ্ধ প্রতর্কের গলি, ব্যঙ্গকণ্টকিত আত্মসমীক্ষা সংশয়িত আত্মদান পার হয়ে বিশ্বের স্থিরকেন্দ্রে নিস্তব্ধ নটরাজে যেখানেই সমস্ত নৃত্য এবং যেখান থেকে, প্রফ্রক, ওয়েস্টল্যাণ্ড, অ্যাশ ওয়েড্‌নস্‌ডে পিছনে রেখে ফোর কোয়ার্টেটসে অথচ এই কবি হন রবীন্দ্রনাথ।

কথাদের ওই চাপেই ঘটে কবিতার উদ্‌ভ্রান্ত ঘটনা। শব্দরা এজন্যই সেখানে প্রতীক লাগে না আর যেমন আমাদের, স্বাদে স্পর্শে দৃশ্যমানরূপে গন্ধে তারা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণতই বস্তু স্বরূপে, স্বভাবে। কবিতায় বিচলিত হতে হয় বস্তুরই আঘাতে এবং অনুভূত হয় সে সংসারের প্রতিরূপ বলে' নয়, কবিতা বলেই সে বাস্তব, যেমন বাস্তব নয় সংসারও। কবিতা তাই দাঁড়িয়ে মাটিতে আর সে মাটি নয় বাপের বরং আপন দাপেরই। মাটির সে সাদৃশ্যেই কবিতায় প্রতারিত আমরা বিশ্বমায়ার বিভায়, সংসার সংরাগে। অন্তর্গত ভিতরে সে আছে আমাদের এই মাটি জল পাখি হিংসা হত্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে, তার আপন মাটিরই দাপটে এবং যা যেহেতু আমাদের অনেকেরই নেই আয়ত্তে। অধিকাংশেরই থাকা ছায়া সহচর তৃণখণ্ডটুকু আঁকড়ে, বেঁচে আছে মুষ্টিমেয় এবং তাঁদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অথবা অসম্ভব সিদ্ধান্ত করে' নিয়ে একেবারেই চোখ বন্ধ করে' অবশিষ্টরা চলেছে নিঃশব্দ নিশ্চল অন্ধকারে, মাথানীচু। তাঁদের কথা নয় জীবন, সভ্যতা বা সংস্কৃতি এবং সেইজন্য কবিতাও নয়। তাই আমাদের এখানে যে পাখি গান গায় না কখনো বড় জোর হয়তো ডেকে ওঠে, কবির জানালা ফেলে আসা তার একটি পালখেই জেগেছে ভোরে প্রথম আলো জলের ওপারে, মানুষের সংস্কৃতিতে কখনো বা সে পাখিই মুখে করে' এনেছে একটি ঘর, স্ত্রী ও শিশুর হাসিমুখ। যদিও বিপরীত শোনাবে তবু এই ঘটনামূল প্রত্যক্ষতার অভিমুখী হয়েই কবিতা সরে' এসেছে সংসার থেকে দূরে এবং বোধ হয় তাতেই ফিরে এসেছে আবার জ্যোতিষ্মান সত্যে উদ্ভাসিত তার মুখ নিয়ে।

প্রত্যক্ষতার এ চর্চ্চা সংসারে নেই বলে সেদিক থেকে কবিতার কাছে দাবি হয়েছে অনেক সময়ই অদ্ভুত, কবিতায় হয়নি ইচ্ছাপূরণ। স্বপ্রতিষ্ঠ সে আমাদের মতো পরাশ্রয়ীর দিকে ফিরেও তাকায় না। তার কাছে যেতে হলে তাকাতে হয় তারই দিকে এবং কবিতার সেই জীবন থেকেই জানতে হয় জীবনকে। জীবন আছে যেমন অন্তত যদি গায়ের জোরে অস্বীকার করা না হয় মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্দেশকে, আমাদের প্রবহমান স্রোতে মহামানবদেরই জীবনচর্যায়, ঠিক তেমনি করে আছে কবিতায়। কিছু কিছু প্রাচীন কাব্য যেমন একসময় জাতিগত ভাবেই হয়েছে জীবনবেদ, দান্তে হাত ধরেছিলেন ভার্জিলের, জীবনকে চেয়েছে যারা অন্তত মননেও তারা কেউ কেউ আজও তাই আসেন কবিরই কাছে, তারই কাছে প্রার্থনা করেন জীবনচৈতন্য, বলেন—

তোমার আকাশ দাও, কবি দাও
দীর্ঘ আশিবছরের,

আমাদের ক্ষীয়মান মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,.....
সহজ অভ্যাস ফেলে সকালে সন্ধ্যায় বারোমাস
বছরে বছরে গড়ে যাই জীবনের স্বাধীন বিন্যাস,
নিভৃত ছায়ায় চৈত্রে শালবনে
তোমার বসন্তগানে রক্তরাগে হৃদয় স্পন্দনে
আমাদের দিনের পাপড়িতে, জীবনের ফুলে ফলে
ভ্রমর গুঞ্জনে নব পল্লবমর্ম্মরে
গড়ে' তুলি আজ, কাল, মাসে মাসে শতবর্ষ পরে
আমাদের প্রতিদিন কবি॥

কবিতা থেকেই জীবনের পাঠ নিয়ে যাওয়া যায় কবিতায় এবং তখনই মাত্র স্পষ্ট হতে পারে যে কবিতার সেই অন্যবিশ্ব বা অন্য মুলতা নয় নিরালম্ব কিছু। বরং আমাদের দৈনন্দিন অব্যক্ত সংসার সীমায় কবিতাই একমাত্র ব্যক্ত ও সেইজন্য সত্য।

আমাদের যদিও নয়, কারণ অভ্যাস নেই, বিশ্বাসও নেই, একজন কবির শেষ পর্যন্ত প্রথম থেকেই সন্ধান জীবন এবং সত্য। সময়ের হাত ধরে' আমাদেরই পাশে সময়হীনতায় প্রত্যক্ষের অভিমুখে কবিরা চলেছেন জীবনের যাত্রী নিজেরাই শেষে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত ও সত্য হয়েছেন এবং এমনটি মনে হয় আর ঘটনা কিছুতেই কখনোই। আমরা তো বাদই পড়েছি, দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সাধনা, দেশপ্রেমিকের দেশকে ভালবাসার যে আত্মোৎসর্গে পরিচিতের রেখাগুলো ক্রমেই ধূসর সেখানেও সত্যের এতদূর প্রত্যক্ষতা সম্ভবত আসেনা। অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে পড়ে আছে রত্নহার, তরবারি, উষ্ণীষ, কিংখাবের পোষাক, কিন্তু অভিনেতা নেই, উত্তাপের সাযুজ্য হারিয়ে বিশীর্ণ অগ্নিশিখা। এপাশে সেক্সপীয়রের কাব্যে সেক্সপীয়র আছে তিনি নেই আছে কুশীলবেরাই, একই কবি আছেন সর্বভূতে অথচ দেখা গেল না কেবল ভাদ্রমাসের সকাল বেলায় মুখ চলে যাওয়া সেই অলৌকিক নৌকাটি আর থেকে গুমরে ওঠে একটি কান্না : জীবনের প্রত্যক্ষতায় জ্বলে ওঠে সমস্তটা একসঙ্গে। আত্মদানে কবিতায়, আত্মোপলব্ধির সত্যের এসবের পরে এজন্যই সম্ভবত লীন হবার দি কিছু মরমী সাধনা ছাড়া এবং এদের অনে সাধনায় গান ও কবিতা প্রায় অপরিহার্য হয় আর কোথাও নেই।

ডুবতে কিরে পারে সবাই
রূপ তরঙ্গে যায়রে ভে
মরমের পথ পাইল না যে
রূপেই ভাসায় আপনাকে

রূপের তরঙ্গে ভেসে বেড়াবার মত দুর্গতি নেই, মনে থাকলে প্রেমের কথা সত্যের ডুবতে হয় রূপের গভীরে অবশ্য বর্জনে নয় আসক্তিতেও। কবির সাধনাও সমান্তরালে। সংসারে যেমন প্রধানতই গিতায় ছোট বা বড় করে' কখনো বা উপেক্ষায়ই হয়তো কৃত্রিমকেই সত্য বলে চা ফিকির, নিজের সেই জানাচেনার প্রমত্ত ছাড়তে ছাড়তেই তবে সম্ভব অন্যের শরীরী প্রত্যক্ষতা, সে-ই আছে শুধু নি ডুবিয়ে দিয়ে ; আবার সেখান থেকে স্মৃতি ফিরে তাকানো নিজের মধ্যেকার আমার এরই মোহানায় সিদ্ধি আসে অবচ্ছিন্ন সম

সমগ্রতাকে অধিকার করে' আমারই ভেতরে। কবিতার বাস্তবে, বস্তুচেতনার অনিবার্য হয়েছে তাই বিচিত্র জটিলের গ্রন্থিল সমাপতন ও সমীকরণ। চারপাশেরই নয় শুধু, সমগ্র জীবন আপন এবং অন্যের, চিরজীবন মন্থিত হয়ে নতুন দানা বাঁধে, জন্ম হয় স্ফটিক কঠিন কবিতার, যথেষ্টই প্রকট যা অন্ধেরও কাছে মহাকবিদের রচনায় যুদ্ধ ও প্রেমের, হিংসাঅনুরাগের, স্বর্গনরকের অরণ্য জটিল সমাবেশে। এমনকি গীতিকবিতাও, কারণ সে ও কবিতা এবং জয়েস বলতেন আদিমতম কবিতা। বিচিত্রকে ছেড়ে ইংরেজী গীতিকবিতা একসময় যখন মসৃণতায় লুব্ধ হয়ে পৌঁছেছে নিঃসারতার মুখোমুখি এলিঅট তখন কবিতার পাঠ নিতে এজন্যই সম্ভবত বারবার ফিরেছেন নাটকে। বিচিত্র জটিলই নয় শুধু নিদারুণ বিপরীতও এজন্য কবিতায় মেলে মানিয়ে নেবার স্বাস্থ্যে। ঐ স্বাস্থ্যেই অনাসক্তি অসংলগ্নতার পাশে পাশেই জীবন সংরাগ আবার সে সংরাগের চরিত্রেও প্রতিবেশীত্ব, বিপরীতের আতত টানে নির্মিত হয় কবিতা। এবং কবিতার মৌলস্বভাবে এ বিপরীতকে না মেলাতে পারলে কবিতার সেই অন্যবিশ্ব প্রতিবেশীত্ব তথা কবিচরিত্রের অনাসক্তিকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আছে, সম্ভাবনা আছে ছদ্মবেশ সরিয়ে কবিতাকে চিনতে না পারার, যেমন নিয়তই চোখে পড়ে অজস্র। অথচ চিনতে পারলে ধরা পড়বে যে ভাব, ভাবনা বস্তু যা কিছুই উপকরণ প্রথমে, কবিতায় সে তুচ্ছতা ছাড়িয়ে সংসারের চোখে না হোক, হতে পারে না, স্বভাবেরই স্বচ্ছতায় স্বপ্রতিষ্ঠ তারা এক একটি গোলাপ মাটি থেকে।

অন্য কোথাও কবিতার স্বতন্ত্র বিশ্ব এইখান থেকেই অতএব প্রবেশিকা ধরে' নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। তারপর ক্রমেই যত আরো দেশে দেশে নানা সময়ে স্বীকৃত বেশ কিছু স্থির কবিতা ও কবির অরণ্য জটিল গভীরে অনুস্যূতি ঘটে শ্রমশীল ও বিনয়ী কবিতার পাঠকের কাছে স্বচ্ছতর হয়ে ওঠে একটি ক্রমদীপ্ত প্রজ্ঞা যে নিজেকে বিসর্জনে অন্তর বাহিরের মগ্নতার এক নিবিড়তাতেই কবিতা মানুষের সংসারী ও সংসারবিরাগী প্রায় সমস্ত কর্ম থেকে স্বতন্ত্র। কবিতার সংসার বিরাগে সহস্র বন্ধনের মধ্যে মুক্তির বৈপরীত্য সমীকৃত স্থির অস্থির। সত্তায় আতত মগ্ন এক নিমজ্জন থেকেই পদ্মের পাতায় শিশির কঠিন মুক্তার মত উজ্জ্বল এবং মায়াবী পৃথিবীর কবিতারা উৎসারিত সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী।

I am not speaking
Of my own experience but trying
to give you
Comparisons in a more familiar
medium. I am the old house
With the noxious smell and the sorrow
before morning,
In which all past is present, all
degradation
Is unredeemable. As for what
happens—
Of the past you can only see what is
past,
Not what is always present. That is
what matters.

———

"আরতি"

শ্রীসুশীল কৃষ্ণ সেনগুপ্ত (৩য় বর্ষ, সাহি

যতটুকু পাওয়া যেতে পারে ততটুকুর ওপরই আশার সৌধগড়ে ঘরে এনেছিল অনিল পাশের গ্রামের সব চাইতে সুন্দরী মেয়ে আরতিকে নিজের সহধর্মিনী করে। কিন্তু তা'কে জীবনের সঙ্গিনী ব'লে ধারণ করাই সার হয়েছে মাত্র, তা'কে ধরা ছোঁয়ার সীমায় অনিল আনতে পারে নি আজও। সৌধ তা'র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে ক্ষয়ে ক্ষয়ে কঞ্চি-বেড়ার কুঁড়ে ঘর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

আরতির রূপ আছে; আয়নার দিকে তাকিয়ে বার বার তাই দেখে সে; পাড়ার ছেলেমেয়েদের মুখে ভেসে আসা কথায়, চোখের ইংগিতে অলক্ষ্যে থেকে জানতে পারে পল্লীস্বর্গের সে উর্বশী!

গাঁয়ের মেয়ে ব'লে লেখাপড়া যে করেনি তা' নয়; পাশের শহরের মামার কাছে থেকে নবম শ্রেণীর ধাপ পর্যন্ত উঠেছিল, কিন্তু তারপর নিজের দেহের ভারে ও পূর্ণতায় আর টাল সামলাতে না পেরে, ফোটা শিউলিটির মত গায়ে হলুদ মেখে অনিলের স্পর্শে যৌবনের প্রাতঃসন্ধিক্ষণে সংসার ধরণীতে ঝরে পড়েছে। তবে রুক্ষ ঊষর ধুলোর ওপর পড়ে নি, পড়েছে স্নেহের শিশির ভেজা ঘাসের ওপর; তাই বাঙালী ঘরের গ্রামের বৌ হ'য়েও সে প্রাত্যহিক কাজের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়েছে। স্বামীর সোহাগে সুন্দর মুখের লাবণ্য মলিন হয়নি এখনও বিন্দুমাত্র!

বড়বৌ সরমা নিজের দিদির চাইতেও ভালোবাসে আদরের ছোট বৌ আরতিকে। ভিন্ন-অন্ন অনিল আর তা'র দাদা সুনীল; তাই সংস হাঁড়ি-ঠেলা কাজের দায়িত্বটুকু সম্পূর্ণ স হাসিমুখে ব'য়ে চ'লেছে আজও।

অনিল, পি. ডব্লিউ. ডি-এর মেট। র কুলি-কামিন খাটায়। রোদে পুড়ে, জলে ভি তা'র কাজ। ক্লান্তির কাজল তা'র চোখের কে অনেক আগেই রেখা টেনেছে; মসৃন ল বলিরেখাও স্পষ্ট হয়েছে বিয়ের আগেই।

তবু শুকনো মুখে হাসির বিদ্যুত-ঝলক যখন ও শোনে বন্ধুরা বলছে—আচ্ছা বৌ পেয়ে ভাই। আগুন জ্বালানো রূপ। বর্ষায় কানায় কানায় যৌবন; উপছে পড়ছে যে

তবু এ হাসি সাময়িক। একটা মিথ্যা গ সার্থক অভিনয় যেন। সারাদিনের অবসাদ বি বাড়ী ফিরে প্রীতির পরশ তার দেহের গ্লানি দূর করে দেয়ই না, বরং মনটাকে আরও বি করে যখন অনিল স্পষ্ট বুঝতে পারে আ তাকে ঘৃণা করে।

বিকেলে বাড়ী আসতেই বৌঠান খাবার দেয় সামনে। বিয়ের আগে বৌদির হা খাবার খেয়ে বড় তৃপ্তি পেত অনিল; কিন্তু এ নিজের অধিকারের সম্পদকে আয়ত্বের বাই দেখে বরং বিরক্তই হয় ও। মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁ

ঝাঁঝিয়েও ওঠে— "আজ ও কি পাড়া বেড়াতে গেছেন?" বৌদি বুঝতে পারে প্রশ্নের কারণ। শান্ত স্বরে তাই জবাব— "হ্যাঁ ভাই!"

—"একটা দিনও কি তার বাদ দিলে চলে না!"

—"ছোট মেয়ে তো, একটু গল্প গুজব—"

—"থাম। গল্প গুজব আর গল্প গুজব। দিন-রাতই তো ঐ হ'চ্ছে। আমি যে খেটে খুটে এলাম এখন আমার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করতে পারেন না; সেদিকে কি তাঁর বিন্দুমাত্র লক্ষ্য আছে না হুঁশ আছে।"

—"কেন, আমি তো আছি,— গল্প না হয় আমার সঙ্গেই কর!"

লজ্জা ও রাগে রাঙা মুখে বৌদির দিকে একবার তাকিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে মাথা নিচু করে সোজা পুকুর ঘাটে হাত-পা-মুখ ধুতে চ'লে যায় ও। পথে কাজের অবসরে হিসেব ক'রে ভেবে রাখা কথাগুলো কেমন গুলিয়ে যায়। নিজের ওপর বিরক্তির প্রলেপ পড়ে স্তরে স্তরে।

এমন কথা নিত্যনৈমিত্তিক না হ'লেও আরতির পাড়া বেড়াতে যাওয়াটা রোজকার ব্যাপার। এমন কি রবিবারেও।

রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ফিরে এসে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে ও বিছানায়। ঘুমিয়েও পড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই। অনিল শুতে গিয়ে আগে আদর করে ডাকতো—"এই"—। কোনও সাড়া না দিয়ে বিরক্ত মুখে পাশ ফিরে শুতো আরতি। পরে সামন্য রেগেই তিক্তস্বরে অনিল ঠেলা দিত-"এ্যাই"- আরতিও কড়াস্বরে জবাব দিয়ে পাশ ফিরে শুতো-"আঃ বিরক্ত করো না।" তাই এখন ওকে আর বিরক্ত করে না অনিল। নিঃশব্দে গিয়ে দুর্দম ক্রোধকে কোনও রকমে দমিয়ে রেখে একপাশে জড় হ'য়ে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়ে!

যৌবনের একটা উত্তাপ আছে। জীবনের বাসনা সেই উত্তাপের পাকে বিভিন্ন বৈচিত্র্যে মনের মধ্যে প্রকাশ পায়। কাউকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় মানুষ। আস্বাদন করতে চায় অজ্ঞাত সমস্ত রস ও আনন্দকে। নিজের চিত্ত চাঞ্চল্য, প্রেমপ্রনতা এবং মহৎসত্তাকে বিশেষ কারও মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়; সেই মাধুর্য আস্বাদন করে ও বিশিষ্টকে বিশ্লেষণ করে যা'কে মানুষ আপনার করে তোলে সে কি পুলক লাভ করলো তা জানতে চায় এবং তা'র প্রেম, প্রীতি ও সহজসুখ কেমন সেটুকু জানার কৌতূহলও মেটাতে চায়।

যুবক অনিলও আরতিকে বিয়ে করে এই সমস্ত কিছু আস্বাদনের ইচ্ছায় তাকে নিয়ে কল্পনায় অনেক রঙ্গিন ফানুশ ফুলিয়ে তুলেছিল, কিন্তু স্ত্রীর স্বভাব ও ব্যবহারের ঘায়ে সে সব কবে যে ফেটে ফুটে চুপ্‌সে একাকার হয়ে গেছে তা অনিল মাঝে মধ্যে ভাবতে গেলেও হাঁপিয়ে ওঠে।

তাই তার সমবয়সী বন্ধুরা যখন নবোঢ়াবধূর রসমাধুর্য সম্বন্ধে নানা আলাপ আলোচনা ও ইংগিতপূর্ণ কথোপকথন করে তখন অনিল গর্বের মিথ্যা কাষ্ঠ হাসি হাসে মাত্র। তার নিজের কাছে সে হাসির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে

ধরা পড়লেও বন্ধুরা তা বুঝতে পারে না, উপরন্তু হৃদয়ের সূক্ষ্ম বেদনাকে আরও তীব্র করে ব্যঙ্গ সুরে দু'একজন ব'লে ওঠে,—"না হয় তোর বউই সব চাইতে সুন্দরী ভাই; তাই ব'লে অমন হেয় করে চাপা হাসির কি দরকার শুনি। আমাদের কালো, তাই-ই ভালো।" অন্যেরা সব একথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেও অনিল হাসতে পারে না। ওর ছোট মুখ আরও ছোট হয়ে যায়।

স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয়। সংকল্প যেদিন কঠিন হ'য়ে ওঠে, নিজেকে সংযত না রাখতে পেরে অনিল সোজা জিজ্ঞাসা করে—"আরতি, আমাকে কি তোমার মোটেই ভালো লাগে না?"

আরতি এমন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি কোনও দিন। জোরে ধমকও দিতে পারেনি অনিল—বোদি ছুটে আসবেন। আবার চাপা ধমক যদি দিয়েছে কোনও দিন, দেখেছে আরতি বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, রাত্রে খায়নি, যা সামান্য কথা ব'লতো তা'ও আর বলেনি দু'চার দিন ধরে।

বড়ভাই সুনীল খাতালেখার কাজ করে—"নবীন রাইস মিলে।" জমি-জায়গাও দেখা-শুনা করে নিজেদের। দিনের শেষে ক্লান্তি নিয়ে অনিলের মত সেও বাড়ীতে ফেরে। সরমা বালতি ক'রে জল এনে রাখে পুকুর থেকে, স্বামী আসতে নিজেই বালতি থেকে জল নিয়ে পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দেয়। আসন পেতে খেতে দিয়ে সামনে ব'সে পাখা করতে করতে কত গল্প করে, প্রাণের কথা, পাড়ার সংসারের কথা, সব কথা একের পর এক যায় পরম সোহাগের সুরে।

দাওয়ায় একলা ব'সে অনিল তাকিয়ে তা দেখে। আরতি তখন পাড়ায় কারও বা হয়তো গল্পে গুলজার! সায়াহ্নের ভারী বাত সঙ্গে অনিলের বিদগ্ধ হৃদয়ের উত্তপ্ত দীর্ঘ নি নিঃশব্দে মিশে যায়। তা'র অনুরণন হৃদয়ের আবেগের তন্ত্রীতে ঘা দিতে পারে একটানা নিঃসঙ্গতায় সহানুভূতির সঙ্গলাভও হ'য়ে ওঠে না অনিলের ভাগ্যে!

দর্শনে হৃদয়ের বৃত্তি তীব্র হয়ে ওঠে অন্তরের অবচেতন অবস্থায় যা ছিল আত্মগো করে তাকে জাগ্রত করে তোলে মুহূর্তের ম কামনা প্রকাশ পায় প্রবলভাবে।

অনিল দেখে—সুনীল কাজ থেকে সরমাকে ডেকে বলেছে কতদিন—"মাথাটা টিপে দেবে গো। বড় টন্ টন্ করছে অ সন্ধ্যাপ্রদীপের সলতে পাকানো ফেলে স্বামীর মাথা টিপে দিতে সরমা উঠে গেছে হয়ে। মাথার মধ্যে তখন কোনও যন্ত্রণ থাকলেও তখন রগের কাছটায় কেমন দপ্ ব্যথা অনুভব করেছে অনিল। আরতি ফিরলে বলেওছে দু'একদিন—"আরু, ম একটু টিপে দেবে!" আরতি তখন প লাইব্রেরী থেকে আনা কোনও রহস্য উপন্য গোয়েন্দার সঙ্গে দুর্গম পথে দুঃসাহসিক সফ হয়ে গেছে। স্বামীর মাথা টিপে দেবার মত তখন তার আর হয়ে ওঠেনি! শুধু দু'একদি

এই সময় বা অবসর তার কোনও দিনই হয়ে উঠতো না। অনিলও বুঝতে পারতো না সেই সুবর্ণ সুযোগ লাভের সৌভাগ্য তার কবে হবে। সেইজন্য কোনও অনুরোধ, বা আদেশও আর করে না আরতিকে। আরতি তার রূপ আর দেহ নিয়েই সর্ব্বদা বড় ব্যস্ত। এর বাইরে সংসারে বা সমাজে যে অন্য কাজ বা কর্ত্তব্য থাকতে পারে এমন কোন ধারনাই বোধ হয় ওর নেই!

মাস দুই আগে কাজ খুব বেড়েছে বলে সকাল ছটায় বেরিয়ে রাত্রি আটটা নটা নাগাদ ফিরছিল অনিল। দুপুরে আধ ঘণ্টার টিফিনে বাড়ীতে এসে অনায়াসে ভাত খেয়ে যেতে পারতো কিন্তু ইচ্ছা করেই ও আসতো না; কাজের কারণ দেখিয়ে কোন ও একটা দোকানে মুড়ি ঝালবড়া কিনে খেয়েই দিন কাটিয়ে দিত। ওর কাছে এটাই ছিল ভালো; বাড়ীতে যা কিছু খেতো কেমন যেন তেঁতো বিস্বাদ লাগতো; বাড়ীর সদর দরজায় চৌকাঠ পেরিয়েই ওর হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলো যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো!

সংসারের প্রতি প্রতিদিনের যে তীব্র বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি জমে উঠেছিল সেই চিন্তা ও নিরানন্দ অনুভূতি অন্তরে বিষাক্ত ছোবল মেরে তিলে তিলে অনিলের দেহটাকে জর্জরিত করে তুলেছিল। মনের মধ্যে সুস্থ ও কর্মঠ থাকার ইচ্ছা যথেষ্ট থাকলেও কল্পনায় মৃত্যু-বিলাসের সাময়িক স্বস্তিতে বুক ভরে উঠতো অবসর সময়ে। কাজে ও তাই আর তেমন উৎসাহ পেত না ও। ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার বড়সাহেবেরা কাজ দেখতে এসে ভৎর্সনা করতেন— "কিহে অনিল, তোমার মত কাজের লোকও আজকাল বেশ ফাঁকি দিতে শিখেছে দেখছি।" অনিল মাথা নিচু করে থেকেছে; কোনও জবাব দেয়নি। তার বাড়ীর লোকে জানে সে এত কাজে ব্যস্ত যে দুপুরে খেতে আসার সময় পর্যন্ত পায় না, আর তার আপিসের লোকেরা জানেন সে এত অকাজে ব্যস্ত যে ভালো কাজ দেখানোর সময় আর খুঁজে পায় না।

পুরুষ হলেও চরম অসহায় অবস্থায় শূন্য আকাশের দিকে হতাশ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কান্নার একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করেছে ও তখন। দুর্বল হয়ে পড়েছে শক্তি ও সামর্থের অবক্ষয়ে। নিজেকে নিজের কাছেই বড় দুর্বিসহ বলে মনে হয়েছে। টেনে নিয়ে যেতে পারে নি আর তাই।

বিছানায় এসে যেদিন প্রথম শুয়েছিল, সেদিন ওর গায়ে ছিল একশ'চার ডিগ্রি উত্তাপ। অন্তরের তাপ সেদিন দেহের উত্তাপের চাইতে অনেক বেশী ছিল বলেই হয়তো সংসারের সুখী, অভিমানী ছোট ভাই অনিল তার অসুস্থতাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি!

ডাক্তার এসে বলেছিলেন—"টাইফয়েড্।" ওষুধ, পথ্য সব এলো। ত্রুটি রইল না কিছুর। শুধু আরতি তখনও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফেস পাউডার ঘষেছে গালে, চোখে টেনেছে সুর্মার রেখা। তার অপরূপ রূপের গর্বে এবং শান্ত স্বভাবের অহংকারে সে তখনও এত মগ্ন ছিল যে জগতে কেউ যে তাকে হেয় করতে পারে এমন

ধারণাই ওর মনের কোথাও কোথাও ধাক্কা দিতে পারে নি। কিন্তু বড়বৌ যেদিন প্রথম এসে বলেছিল ছোটবৌ, তুই তো ভাই তোর রূপ নিয়েই ম'লি; তোর স্বামী মরে গেলেও দেখবি না; একটিবার কাছেও যাবি না। কিন্তু ওকে আমাদের তো বাঁচাতে হবে ভাই। ডাক্তার বলেছে বড় শক্ত ব্যারাম। ভালো করে চিকিচ্ছে, সেবা শুস্রূষা না করলে অবস্থা খারাপ হতে পারে। তাই ঠাকুরপোকে দেখার ভারটা না হয় আমিই নিলাম তুই বরং আমাদের জন্যে দুটো চালে ডালে কোনও রকমে দু'বেলা কষ্টে ছিষ্টে ফুটিয়ে দিস। বড়ও তো হয়েছিস, এটা নিশ্চয় পারবি। আর না পারলেও অন্ততঃ ঠাকুরপো ভালো না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ঘরে সরে চালিয়ে নিতে হবে ভাই। আজ থেকে ভাঁড়ারে হেঁসেলের ভার তোর ওপরেই থাকলো।" সেদিন আরতির বুকে কোন্ একটা দুর্বল স্থানে প্রথম ধাক্কা লেগেছিল। প্রথম তা'র অযোগ্যতার আস্বাদ পেয়ে হঠাৎ কোথায় যেন অনেকখানি ছোট হ'য়ে গেছিল সকলের কাছে।

এরপর দেখেছে বড় বৌ সমস্ত কাজের ফাঁকে এক সময় এসে স্বামীর শুশ্রূষা ক'রে গেছে; খাওয়ার সময় সামনে ব'সে খাইয়েছে; এবং সব চাইতে বেশী করে ছ'বছরের একমাত্র ছেলে পল্টনকে আগলে আগলে রেখেছে সব সময়। কাকার ঘরে ঢুকতে দেয়নি, ছোট বৌকে নানা কাই-ফরমাস ক'রে পল্টনকে ভালো ক'রে খাওয়াতে, পরাতে, কাজল পরাতে, শোয়াতে কখনো আদেশ, কখনো অনুরোধ ক'রেছে। এবং কাকীমা হ'য়ে একটা ছ'বছরের ছোট ছেলেকে আদর করতে গিয়ে প্রথম বুকে জড়িয়ে ধরে এমন এক অবর্ণনীয় শিহরণ অনুভব করেছি সর্বাঙ্গে যে, তা'র মাতৃত্বের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলে তীব্রভাবে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বার বার দংশন ক দুঃসহ জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল।

তার ওপর শুনতে হয়েছে—বড়ঠাকু বলেছেন—"তোমাদের ছোট বৌ কিস্যু হ' নাগো। শুধু রূপই আছে, কাজের কিছু নেই ভালো রান্না-বান্নাতো জানেই না, এমন কি স্বামী সেবাও যে কেমন ক'রে করতে হয় সেটুকু পর্য্য ওর বাবা মা শিখিয়ে দেন নি ভাল করে।

নিজের আত্ম-সম্মানে এ ধাক্কা ওর কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল আবার নিজের এই অকৃতি ও সমস্ত কাজের মধ্যে অপটুতা দিন দিন লক্ষ ক'রে এবং রান্নায় পরিশ্রম, কাঠের ধোঁয়া, আগুনে উত্তাপে চোখের জলে, নাকের জলে ক'রে সং সারের কর্ত্তব্যবোধ এবং গৃহিনীর দায়িত্বভার যে কী গুরুভার তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি ক'রে আরতি আয়নার সামনে দাঁড়াতে আস্তে আস্তে প্রায় ভুলেই গেল। এখনও রঙিন সিল্কের শাড়ীর চাইতে সূতি লাল-পাড় আট-পৌরে শাড়ী বেশী পছন্দ করে; গা-ভরা গয়নার চাইতে শুধু এক জোড়া শাঁখা আর একটা লোহাই তার হাতে বড় সুন্দর লাগে।

জামায়ের অসুখের বাড়বাড়ি শুনে আরতির বাবা ভূপতিবাবু অনিলকে দেখতে এসে তার মাথার শিয়রে সরমাকে দেখে প্রথমে একটু ক্ষুণ্ণই হ'লেন; কিন্তু সরমা আরতির সামনেই যখন তাঁকে শুনিয়ে দিল—"কি শিক্ষাই দিয়েছেন

বাবা আপনার মেয়েকে। প্রায় এক বছর হ'লো ও সোয়ামীর সঙ্গে ঘর করছেন, কিন্তু কোনদিন ঠাকুরপোর ভীষণ মাথা ধরলেও ও একটু টিপে দেবার অবসর পায় নি। বই আর পাউডার-সেন্ট নিয়েই আয়নার সামনে ব'সে ব'সে দিন কাটিয়ে দিল।"

পাথর হ'য়ে শুনলো আরতি সব কথা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। ক্ষোভে লজ্জায় দৈন্যে তাঁর বুকের পাঁজরগুলো মোচড় দিয়ে উঠলেও কোনও প্রতিবাদ করতে পারেনি একটি কথারও।

শুধু এখন যে তা'র রূপের খোলস ভেঙে কর্ত্তব্যের রোদে, জলে, বাতাসে নারীত্বের অঙ্কুর বেরিয়ে সংসারের মাটি ফুঁড়ে অনেক নীচে শিরা চালিয়ে দিয়েছে; তা'র লতাজীবন দু'হাতের আঁকশি দিয়ে নিবিড় ক'রে প্রিয়-পরম, জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, সার্থক হতে চায়—এই কথাটা কোনও ভাবে বুঝিয়ে বলার ভাষা কোথাও খুঁজে না পেয়ে নিজেকে আর ঠিক রাখতে না পেরে তার উনিশ বছরের জীবনে সর্ব্বপ্রথম একটি অপর মানুষের জন্যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পাশের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলো।

মেয়ের কান্নার শব্দ পেয়ে বাবা কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে ব'ললেন —"একি করেছিস আরুমা! অনিল যে তোর স্বামী, তোর জীবনের সব। আজ অসুখের দিনে তারপাশে--"

বাবাকে থামিয়ে দিয়ে ছোট মেয়ের মত তাঁর কোলে মুখটা লুকিয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠে বল্লে—"জানি, জানি বাবা, জানি। এ ভুল আর, আর কখনো আমার হবে না—"

অনিলের অসুখটা দিন দিন খারাপের দিকেই চ'লেছিল। বৌদি হাজার চেষ্টা ক'রেও ওকে নিয়মিত ওষুধ খাওয়াতে, পথ্য খাওয়াতে পারেনি একদিনও; মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় অকালে বরণ করে নেবার জন্যে মনে মনে যেন একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছিল ও।

কিন্তু আজ রাত্রে অনিল যখন তাকিয়ে দেখলো ঘরের আলোটা বড় বেশি ম্লান, এবং অন্যদিনের মত মাথার ওপরে একটি পরিচিত হাতের স্পর্শ নেই; এমন কি 'ঠাকুরপো এটা খেয়ে নাও ভাই'—এই সম্বোধনও নেই; তার পরিবর্ত্তে একটি কোমল কচি হাতের কম্পিত মৃদুস্পর্শ তার উত্তপ্ত ললাটে পরম শীতলতার প্রলেপ দিয়ে আস্তে আস্তে মৃদু চাপ দিয়ে চলেছে, তখন তাঁর রক্তহীন ফ্যাকাশে চোখের ঝাপসা দৃষ্টি ওপরে তুলে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো—এতদিন যাকে প্রতি মুহূর্তে মনে মনে ও ধ্যান করছে, যা'র এতটুকু করস্পর্শের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়েছিল প্রতিটি ক্ষণে, সেই গর্ব্বের, আনন্দের উৎস অর্দ্ধাঙ্গিনী আরতি তার মাথার পাশে বসে! উদ্বেল, উচ্ছল হৃদয়ে অনিল আরও ভাল করে চেয়ে দেখলো লণ্ঠনের নিষ্প্রভ আলোয় সবকিছু অস্পষ্ট লাগলেও আরতির নিটোল মসৃণ গালে দুটি অশ্রুরেখা সুস্পষ্ট হয়ে চিক্ চিক্ করছে তখন।

অনিলের রুগ্ন শুষ্ক, পাণ্ডুর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠে ক্ষীণ কণ্ঠ ব্যাকুল ও বিস্মিতস্বরে শুধু 'আরতি' এইটুকু উচ্চারণ করা মাত্র দীর্ঘ দিনের দেহের সমস্ত গ্লানি, রোগের জ্বালা, যন্ত্রণাকে মুহূর্তের মধ্যে নিরাময় ক'রে এবং যতটুকু পাবার আশা ক'রেছিল তা'র চাইতে অনেক বেশি দিয়ে স্বামীর অন্তরকে পূর্ণতৃপ্ত ক'রে আরতি অনিলের মুখটাকে সমস্ত আবেগ ও আকুলতা দিয়ে জড়িয়ে ধরে আনন্দ ও বেদনায় বিগলিত অশ্রুধারায় একেবারে ভিজিয়ে দিল।

শানিত বিষাদ

পার্থ রাহা (তৃতীয় বর্ষ, সাহিত্য)

সিন্দুকে রয়েছে, আমি কাল ভোরবেলা উঠে
বাইরের ঘরে রাখবো।
সবাই দেখুক, স্বচ্ছ আনন্দিত যাবো এক ছুটে
বড়ো রাস্তায় রৌদ্রে— উৎসব সহজ কণ্ঠ, আমারও উজ্জ্বল জানা, আমি
চীৎকার করে ডাকবো ফেরিওয়ালা। রঙীন ছবির আলো দুহাতে কিনবো।
সারাদিন অসহ্য রাত্রির আঁধার কুটীল বাদামী।

কারা আসে আমি স্পষ্ট অনুভব করি। যারা আসে ঘরের ভিতর
সন্দিগ্ধ হলুদ দৃষ্টি। চাপা ঠোঁটে কথা বলে, ঘৃণা
প্রতি পদক্ষেপে। অথচ, কী ভালোবাসা কণ্ঠের উত্তাপ প্রীতস্বর।
অসুস্থ শরীর, দেখে চোখে জল আসে, কেন যে জানি না
কেউ ভালবাসলেই চোখে জল আসে। কিন্তু ওরা কিরকম চায়—
সিন্দুক ও ঘরে আছে। কিছুতেই কেউ জানতে পারবে না।

অন্ধকারে সিন্দুক খুলেছি যেই পাতা উড়ে এসেছে হাওয়ায়
কোথায় বকুল নাকি যুঁই, সুদূর সৌরভ নীল আন্তরিক চেনা।
হীরা ঝলমল করে সোনার কাঁকন
গোপনে নিয়েছি তার হাত থেকে খুলে, অপহৃত নির্মম সম্পদ।
কতদিন ঘরের ভিতর আমি কতদিন রূঢ় প্রতিবাদে
সকলকে ফিরিয়েছি। আকাশে একটু যেন দেখা যায় মেঘের মাতন
স্বাগত প্রস্তুত ছবি অসীম শরৎকাল। অন্ধকার শাণিত বিষাদে॥

অনুভব

সমরেশ মজুমদার (প্রাক্তন ছাত্র)

অকস্মাৎ স্বপ্ন ভাঙে বিপন্ন এ-নিষ্ঠুর সময়ে
বধির কবন্ধ ছুঁয়ে চিত্রার্পিত আপাদমস্তক
সময়ের গূঢ় অভিপ্রায়। তখন বসন্ত ফাল্গুনে
মধুদ্রুমে বিমল সৌরভ। অনূঢ়া তরুণী অস্থির
বীথিকার ঋতুর প্রৌঢ়তায়। অরণ্যেই মৃত হবে
সে কথা ভাবিনি কখনো—পরাগে অশ্রু ছিল
পুষ্পের, শতধা বিভক্ত প্রপঞ্চের ব্যর্থ সমারোহে ;
বিপন্ন সময়কে ঘিরে রাত্রি জরার মতো ভ্রান্তিবিলাসে।

এখনও নির্জনে ভাবি : অন্তর্লীন কোনো সত্য যদি
সময়ের ভ্রান্ত পদক্ষেপে পদচ্যুতি ঘটে, তবে
মেঘদূত পাঠাবোনা মিতচারী হয়ে লগ্নশেষে
এ-সত্য নিয়তই অন্বিষ্ট : জরা হোক্
তবু সে-তো একান্তই প্রার্থিত যৌবন—
হোক্ সে বিপন্ন সময়ে নিষ্ঠুর মূঢ় অবেলায়।

———

শান্তি

শান্তশীল সেনগুপ্ত (তৃতীয় বর্ষ, সাহিত্য)

তুমি কোন্ অতীতের বিস্মৃত আলোকে
হারিয়েছো সমুদ্রের শুভ্র ফেনা নিয়ে
সাইক্লোন- শ্রান্ত কোনও ইন্দ্রধনু রঙমাখা জলবিন্দু সাথে
ঊর্দ্ধমুখে বলাকার গতিরেখা ধরে।
উড়ে গেছো উদাত্ত আবেগে জীবনের নবীন সন্ধানে
হিমাদ্রির শ্বেতশৃঙ্গ ছেড়ে
পিছে ফেলে শ্যামলের সবুজ-ইংগিত,
প্রশান্তের উত্তাল সুগভীর সাগরের সর্বোচ্চ ঊর্মি নিয়ে পাড়ি।
অতীত এসেছে ফিরে যুগের আবর্তে ফের
পৃথিবীর নিত্য-সত্য নীতি নিয়ে বুকে
সেই মহারণজয়ী শৌর্যদীপ্ত রাঘবের চরিত্রের দ্যুতি
বীরত্বের অর্জুন-বিক্রম
এসেছে আবার নব তূণ নিয়ে পিঠে,
হাতে নিয়ে শতাশ্ব শক্তিতে শক্ত শঙ্কর ধনু
মর্ত্য-মন ক'রে নিতে জয়
রহস্য গোপন পথে,
বুদ্ধির বর্ম প'রে
বক্ষে ব'য়ে জীবনের শ্বাস।
শাশ্বতী সে যুগজয়ী মহাকাব্য আজ
আঁখির আলোকে ভাসে
জীবন্ত আঁখরে ;
বন্দী-বাণী অন্ধযুগ কারাগার অবরোধ ভেঙ্গে
মুক্ত তেজে
ধরিত্রীর বক্ষ চিঁরে ফের
ধরেছে আপন রূপ শান্তি শেষ ক'রে।
উড্ডয়ন ঊর্দ্ধ মুখে জাগরন ক'রেছে সৃষ্ট সমাপ্তির সীমা।
বিশ্ব তার অনন্ত আবর্তে

এনে দেবে
প্রভাতের রবীন্দ্র-রশ্মির ধ্যানসিদ্ধ ইপ্সিত পরশে
হিমবাহ-জমাট-জীবনে
স্রোতঃস্বতী স্বচ্ছ সলিলের
কলোলিত প্রবাহের চির অধিকার।
যুগের মহান লগ্নে
হৃদয়ের অমোঘ-আহ্বানে
মিলনের মহাসভা হবে আয়োজন,
সেদিন সকল পুণ্যে পূর্ণ হবে ধরণীর
দৈন্য পঙ্গু দীর্ঘশ্বাস-ব্যথা,
দেবত্বের প্রাপ্তি পথে
আপন মহিমা নিয়ে
স্বর্গের দুর্জয় দুয়ার
মানবের কাছে হবে চির অবারিত,
সেদিন শারদ-শুভ্র রজত প্রভাতে
তোমাকেও ফিরে পাবে ব্যথিত ভুবন।

আমি

অমল চক্রবর্ত্তী (দ্বিতীয় বর্ষ, সাহিত্য)

অণুর সমাজে একা
পথ যেতে যেতে
সহসা চেতনার আবির্ভাব
বিদ্যুতের মত অনুভূত হ'ল।

অণুর সমাজে আমি
একা প্রাণময় পথ চলি।
প্রাণহীন তুষার ও
পর্বতের নির্জন প্রদেশে সেই পথ।

অথবা ঘূর্ণ্যমান সূর্য্যেরই মত
উত্তপ্ত বালুকারাশি আর
পীতাভ দিগন্তের সাথে
এক রেখা ধরে সেই পথ
অশেষ যাত্রার পথে
মিশে গেছে।

কিংবা অরণ্য, প্রান্তর বা
অন্য কোনখানে চলেছে।
আমার অশেষ পাথেয়
নিঃশব্দ যাত্রার দীপ জ্বলে
নিজে আমি মৌন প্রতিজ্ঞাতে অপরাজেয়,
সংকল্পের শপথে পথ চলি।

আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক
যে শুধু
পর্বত-আরোহনে রত
সে এক ঈগলের মত
পথ চলে ;

অথচ আশ্চর্য—
তার গন্তব্যস্থল সে নিজেই জানে না।
পথ চলে শুধু লক্ষ্যহীন এক
সঙ্কল্পের স্পর্ধিত শপথ নিয়ে।

অনন্ত সে যাত্রা
তার বিরতি কোথায় কে জানে।

বাঁচার আশা

কাজল বল (তৃতীয় বর্ষ)

আর্শিতে চেহারা দেখতে ভয় লাগে।
হয়তো বা হাড়গুলো বিদ্রূপে অট্টহাস্য করে উঠবে,
নয়তো তার মধ্যেই মৃত্যু-দূতের ফরমানের কথা মনে পড়বে।
শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত চোষা জলের
তীব্র বেদনা ও, অমৃতের কথা মনে পড়ে।
আবর্জনা মাঝে মুখ থুবড়ে পড়েও
বাঁচার আশা নেশার মত পেয়ে বসে।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মৃত্যুর ধ্বনি, তবু দু হাতে
কান চাপা দিই। একটুখানি আশা,
এ যাত্রা বেঁচেও যেতে পারি!

জীবন : সময় : আর্তনাদ

শ্রীকালী কৃষ্ণ গুহ (২য় বর্ষ, সাহিত্য)

আমাকে প্রতিদিন পিছনে ফেলে রেখে অসংখ্য মানুষ চলে যায়। আমার হাতের রজনীগন্ধার মালা শুকিয়ে হয় কাঠ। আমি গান গাইতে চেয়ে ব্যর্থ হই প্রতিদিন। আমি কোনদিন ঝর্ণার মধ্যে শুয়েছিলাম ? কোনদিন কি আমার শরীর থেকে রক্তপাত হয়েছিল ? এই শহরে এ সব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। যখন আমার শরীরে অবসাদ নামে, আমি আমার প্রত্যেকমুহূর্তকে ভয় পাই, যখন আমার সর্বাধিক পরিচিত রমণীর কথাও মনে পড়ে না, তখন এই রূপময়ী ক'লকাতার রক্তকণিকাগুলি কী সোচ্চার হয়ে ওঠে! আমার সম্মুখের সুদীর্ঘ পথ হয়ে যায় বিশাল মরুভূমি।

আমাকে এই বিশাল নির্জন মরুভূমি পার করে নিয়ে যেতে পারে এমন কি কেউ নেই? যারা আমার পথ লাল নিশান দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছিল তারা এখন কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ?

হে সময়, তুমি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারো, যেখানে মানুষের রক্ত জমে জমে হয় কবিতা ? হে ধূসর সময়, তুমি প্রাচীন ব্যবিলনের, মিশরের, চীনের, ভারতবর্ষের বন্ধু ছিলে। তুমি হোয়াংহো, নীলনদ, নর্মদার পার দিয়ে জীবনের জন্য গান গেয়েছিলে। তুমি পাণিপথে, পলাশির প্রান্তরে, নাগাশকি-ফুজিয়া মাতে কতো রাত্রি ঘুমোও নি ! এ সব কথা তোমার মনে পড়ে ?

আমি সময়ের শরীর জড়িয়ে এই বিশাল মরুভূমি পার হয়ে যেতে চাই। আমি আমার নিষ্পাপ আত্মার জন্য কয়েকবার আর্তধ্বনি করে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে চাই এই পৃথিবী থেকে – যেখানে আমার আর্তনাদ গান হয়ে উঠবে।

বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য

স্বপন কুমার রায় (তৃতীয় বর্ষ, সাহিত্য)

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে এক বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলার মাটিতে। সেদিনটা ছিল ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩ সাল। সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রত্যুষ প্রভাত। শিশির-সিক্ত পৃথিবীর বুক থেকে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে বিলীন হ'ল। জ্যোতির্ময়ের দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত হল দশদিক। জন্ম নিল এক বিশাল প্রাণ। সে প্রাণের ছোঁয়ায় জেগে উঠল সমস্ত সুপ্ত পৃথিবী, বিশ্বচরাচর। সেদিন নবোদিত সূর্য্যের সহস্র স্বর্ণরশ্মিতে, খরবাহিনী গঙ্গার কলধ্বনিতে, প্রভাত পাখীর মুখর কলকাকলিতে সেই জন্মবার্ত্তা বিঘোষিত হল দিকে দিকে: 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' সেদিন উদয় শিখরে নতুন সূর্য্যের প্রথম আবির্ভাবে নব যুগের উদ্বোধন হ'ল ভারতবর্ষে। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর বহু প্রতীক্ষার অবসানে জন্ম নিলেন এক মহাপুরুষ, তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। পরাধীন ভারতবর্ষকে, তমসাচ্ছন্ন, আত্মবিস্মৃত জাতিকে প্রচণ্ড আঘাতে জাগাতে, কর্মসাধনা ও সেবাধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর আবির্ভাব। আজ সেই সিংহবীর্য, হৃদিবান মহামানবের শততম জন্ম জয়ন্তী উৎসবের মাহেন্দ্র লগ্ন উপস্থিত। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে আমরা সেই লোকোত্তর বহুমুখী প্রতিভার অসংখ্য দিকের একটি বিশেষ দিক— তাঁর সাহিত্য সাধনা, বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের কথা আলোচনার প্রয়াস পাব।

মাত্র ঊনচল্লিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে কীর্তির মহিমায় ও কর্মশক্তির প্রচণ্ড প্রকাশে বিবেকানন্দ স্মরণীয় পুরুষ। আকণ্ঠ কর্মমগ্ন এই নিষ্কাঞ্চন পরিব্রাজক, সুকঠোর কর্মযোগী সন্ন্যাসীর জীবনে সাহিত্য সাধনার কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না, অবকাশও ছিল কম। সাহিত্য রচনা, শিল্প-সৃষ্টি বা নিজের মনোমুকুরে প্রতিফলিত নিজেরই মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপ দেখবার কোন বাসনাই তাঁর ছিল না। সচেতনভাবে সাহিত্য সাধনা নয়, নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে। তথাপি তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় ও শৌর্যদৃপ্ত, আত্মসমাহিত ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনাবলীকে একটা বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করেছে। সংখ্যার বিচারে তাঁর বাংলা রচনা অত্যল্প; ভাববার কথা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'পরিব্রাজক' ও 'বর্ত্তমান ভারত'— চারটি গদ্য রচনা ও কিছু কবিতা তিনি বাংলায় লিখেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর কিছু বাংলা চিঠিপত্রও সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু এই স্বল্প-সীমার মধ্যেই ভাবে ও ভাষার মৌলিকত্বে এগুলি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাহিত্যের সৃষ্টিমূলক কল্প-জগৎ বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রধান বিষয় নয়। তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনাবলী প্রধানত মননধর্মী। কিন্তু তার মধ্যেই কোথাও পাই একটা আত্মনিবিষ্ট ভাবানুভূতির রূপ, জাগতিক পর্যবেক্ষণের উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চিত্র, কোথাও বা রসাদ্র জীবন চিন্তার মনোরম আলেখ্য। আবার এরই মধ্যে বিধৃত

রয়েছে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কবির্মনীষী সীমাবদ্ধ আত্ম-প্রকাশের মধ্যে তাঁর অন্তরের বিপুল ভাবসম্পদের একটা সামান্য অংশমাত্র আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু সেই স্বল্প পরিচয়েই তা আমাদের সাহিত্যের পরম বিস্ময়।

স্বামীজির বাংলা রচনাগুলি মুখ্যতঃ তারই স্বপ্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পত্র 'উদ্বোধন'কে কেন্দ্র করে লিখিত। তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ সংঘের বাংলা মুখপত্ররূপে এই পত্রিকার আত্ম প্রকাশ। প্রধানতঃ এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই স্বামীজি তাঁর জীবনের শেষ তিনটি বছর বাংলা রচনা-কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিরূপে বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর চারটি গ্রন্থ — 'ভাববার কথা', 'বর্ত্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। এগুলির প্রায় সবক'টিই উদ্বোধনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। ভাববার কথা'র 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি বোধ হয় স্বামীজির লেখা প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। এর আগে তিনি বৈদ্যবচরণ বসাক নামে জনৈক বন্ধুর সঙ্গীত-সঙ্কলনগ্রন্থ 'সঙ্গীত কল্পতরু'র (প্রথম প্রকাশ-ভাদ্র' ১২৯৪) ভূমিকা লিখেছিলেন।

১৩০৫ সালের মাঘ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে স্বামীজি একটি প্রস্তাবনা লেখেন। পরবর্ত্তীকালে এই প্রস্তাবনাটি "ভাববার কথা" প্রবন্ধগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এর নাম পরিবর্ত্তিত করে রাখা হয় 'বর্ত্তমান সমস্যা'। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মনোধর্মের পার্থক্য বিশ্লেষ ক'রে স্বামীজি এই প্রস্তাবনায় লিখেছিলেন.— "ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীব নির্ভর করিতেছে ; নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমো গুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থি হইবে ইহাও নিশ্চিত।"

এই প্রস্তাবনার মধ্য দিয়েই স্বামীজির মহ আদর্শ প্রকাশিত এবং এই আদর্শ সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর পদার্পণ। বিশে দরবারে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করবার এবং বিভি দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের যে আদর্শ ক বিবেকানন্দের সারা জীবনের প্রেরণা ছি সাহিত্যিক বিবেকানন্দের লেখনীতে তাই মূর্ত্তরূ ফুটে উঠেছে।

সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি স্বামীজি অনুরাগ ছোটবেলা থেকেই। তাঁর সহো শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা থেকে এ বিষ জানা যায়,—"বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথে বিদ্যাচর্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাঠ্যাবস্থা হই তিনি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ... ইংরেজী কাব্যের ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথে বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহা হইতে মা মাঝে আবৃত্তি করিতেন। ... সেক্‌স্‌পীয়ার গ্রন্থগুলির সহিত তিনি বিশেষ রূপে পরি ছিলেন। ... বাইরন তিনি খুবই পড়িতেন

ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহা ব্যতীত সাধারণ ইংরেজী কাব্য তিনি প্রধান অধ্যাপকের ন্যায় পড়াইতে পারিতেন।"

"বাঙ্গালা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' এত মন দিয়া পড়িয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে সেই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। .....বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যখানি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল ...দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কথা সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। ..... নীলদর্পন হইতেও তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। ..... কালিদাসের গ্রন্থের ভিতর 'কুমারসম্ভব,' 'শকুন্তলা,'• 'মেঘদূত' তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল।"

সাহিত্যের আদর্শের দিক দিয়ে স্বামীজি কিন্তু কলাকৈবল্যবাদের (Art for Arts sake) সেবক ছিলেন না। আর্টের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসকেই তিনি পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর নিজের রচিত সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য কল্পনা জগৎ বা নিছক সাহিত্য সৃষ্টির জগতে তিনি বিচরণ করেন নি। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার অন্তরালে আছে আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা, কর্মী বিবেকানন্দের বিচিত্র কর্ম প্রয়াস। অবশ্য কেবলমাত্র ধর্ম ও কর্ম জগতেই তাঁর চিন্তা ভাবনা সীমিত থাকেনি। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিষয়েও— বাংলা গদ্য ভাষার উন্নতির জন্য ও তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন। ভাষা সম্পর্কিত তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও বাংলা ভাষা গঠন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ এক বিশিষ্ট বাণীভঙ্গীর অধিকারী। স্বামীজির গভীর আত্মপ্রত্যয়, তেজস্বিতা ও মহান্ আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনা ভঙ্গীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এই খানেই তিনি স্বতন্ত্র। অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তার পার্থক্য এইখানেই। রচনাশৈলী উপস্থাপক ও প্রকাশ ভঙ্গীর সহজ স্বাতন্ত্রে তিনি চিহ্নিত। 'Style is the man' এই কথাটির সার্থক পরিচয় বহন করেছে তাঁর লেখনী। সহজ সরল অথচ তেজোদীপ্ত ভাষায় অন্তরের বলিষ্ঠ ভাব ও ভাবনার সুষ্ঠু-সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি চলিত ভাষা ও রীতি প্রয়োগেরই পক্ষপাতী ছিলেন। চলিত ভাষার আবেদন জনসাধারণের কাছে যত অধিক সাধু ভাষায় তত নয়। তাই গণ মানুষের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁর এই উপলব্ধি।

উনিশ শতকে বাংলা ভাষার গতি প্রকৃতি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল বিবেকানন্দের মধ্যে তা সার্থকতা পেয়েছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের প্রভাব তখন বাঙ্গালী সাহিত্যিক মধ্যে বেশী। কিন্তু বিবেকানন্দ সে পথ অনুসরণ করেন নি। তাঁর ভাষা ও বাণী ভঙ্গির ক্ষেত্রে একজনের প্রভাবই অধিক— তিনি তার মন্ত্রগুরু দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণদেব। এই প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন :

"Simplicity is the secret. My ideal of language is my Master's language, most colloquial and yet most expressive. It must express the thought which is intended to be conveyed."

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর সরলতাই তার চলিত ভাষায় সাহিত্য সাধনার প্রেরণা। চলিত ভাষার স্বপক্ষে তিনি বলেছেন, "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা আর হতেই পারে না;··· চলিত ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয়না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা জয় করে কি হবে?" নিজের লেখার মধ্য দিয়েও তিনি এর যে উৎকর্ষ দেখিয়েছেন উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তা প্রায় বিরল। সেই সময় বাংলা চলিত ভাষার গঠনে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রয়াস স্মরনীয়। মুখের ভাষাকে তাঁরা সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভাষা কেবল রঙ্গ রসিকতার ভাষা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাষা, উঁচু ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। উভয়ের লেখাতেই সাধু ও চলিত দুইই এসে গেছে। কিন্তু বিবেকানন্দের চলিত ভাষা সবরকম ভাব প্রকাশেরই উপযোগী ছিল— 'যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর— আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।' আরও পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ-পত্রে'র মধ্য দিয়ে এর সার্থকতা এনেছেন।

অবশ্য শুধু চলিত ভাষাতেই বিবেকানন্দ সাহিত্য রচনা করেন নি, প্রয়োজনমত সাধুভাষ অসঙ্কোচে ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'পরিব্রাজ ভাববার কথা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইয়ের ভ আর 'বর্ত্তমান ভারত' বই এর ভাষা একজাতী নয়।

'পরিব্রাজক' বইটি স্বামীজির দ্বিতীয়ব পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কাহিনী। 'উদ্বোধ পত্রিকার প্রথমবর্ষে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' না ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। পরে পুস্তকাকা 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত হয়। বিদেশে বিচিত্র প্রাকৃতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁ লিপি কৌশলে মনোরম হয়ে ফুটে উঠেছে দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে এই য যুগের পরিব্রাজক ভারতের সাধনার বাণী বহ করে চলেছেন, আর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জগতে বিচিত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের সংবাদ সহজ ভাষায় বিত করছেন। কখনও তিনি ঐতিহাসিক, কখন দার্শনিক, কখনও কবি, কখনো বা স্বদেশপ্রেমে সহানুভূতিতে ব্যথা বেদনায় করুণাদ্রহৃদি। ত বিদেশে গিয়েও ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আনন্দের রসাস্বাদনের মধ্যেও ভোলেন নি দরি ভারতবাসীর কথা, সাধারণ মানুষের কথা। সুয়ে খালের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি এশিয়া ও য়ুরোপের ম বড় সভ্যতার পশ্চাতে ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবীদে দানের কথা স্মরণ করেছেন,—"হে ভারতে শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরতনিন্দিত পরি শ্রমের ফলস্বরূপ বাবিলন, ইরান, আলাকজান্দ্রিয় গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য। আ তুমি?—কে ভাবে একথা····যাদের রুধিরস্রোতে

মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি, তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী স্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য, কিন্তু কেউ যেখানে দেখেনা, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা,—আমাদের গরীবেরা ঘরদুয়ারে দিন রাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নেই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপর ও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্রকার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা—ভারতের চির পদদলিত শ্রমজীবি! তোমাদের প্রণাম করি।"

গণজীবনের সঙ্গে বিবেকান্দের এই শ্রদ্ধা ও ও একান্ত আত্মীয়তা তার পরিব্রাজক জীবনে ভারত ভ্রমণের ফল। রাজা মহারাজ থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের লোকের সঙ্গে সমানভাবে মিশেছেন তিনি। অনুভব করেছেন তাদের সুখ দুখের কথা 'হৃদয়ে হৃদয় যোগ করে'। তাই ত তিনি মহান সাহিত্যিক! এই লেখার মধ্য দিয়ে তার গণচেতনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় আমরা পাই বাংলা সাহিত্যে তা বহু পরবর্ত্তীকালের। সাহিত্য বিচারে তার এই কৃতিত্বের তুলনা শুধু তৎকালীন সময়েনয় সমসাময়িক কালেও দুর্লভ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইখানিতে স্বামীজির গম্ভীর মননশীলতা, ভূয়োদর্শন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য, ধর্ম্ম ও চারিত্রিক বিচার বিশ্লেষণ স্বামীজির লিপি-কুশলতায় অনন্যভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনায় প্রাচ্য দেশসমূহের জাতীয়ভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজি প্রধাণতঃ ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও উদার।

ভাববার কথা স্বামীজির কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধের সমষ্টি। এর মধ্যে রয়েছে 'বাংলা ভাষা,' 'হিন্দু ধর্ম্ম' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ,' বর্ত্তমান সমস্যা,' জ্ঞানার্জ্জন রামকৃষ্ণ ও তাঁর উক্তি প্রভৃতি কয়েকটি সুচিন্তিত বিখ্যাত প্রবন্ধ। 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধের মধ্যে বাংলা গদ্যভাষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ভাবনার অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। ভাষাকে সহজ, সরল করার প্রতিই তাঁর লক্ষ্য। 'বর্ত্তমান সমস্যা' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের সংঘাত ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিন্তাধারায় উপর প্রভাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে। 'জ্ঞানার্জ্জন' প্রত্যক্ষবাদী ও আধুনিক এবং অপ্রত্যক্ষবাদী চিন্তাধারায় তুলনা-মূলক সমালোচনা। রামকৃষ্ণ বিষয়ক প্রবন্ধ দুটির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য ও বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধায় তাঁর দানের কথাআলোচনা করেছেন।

'বর্ত্তমান ভারত' গ্রন্থটির মধ্যে ঐতিহাসিক বিবেকানন্দ আর দার্শনিক বিবেকানন্দ—স্বামীজির এই দুই রূপের একত্র প্রকাশ ঘটেছে। গ্রন্থের বিষয় বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ভাষার মধ্যেও রয়েছে স্বামীজির ধ্রুপদী রচনারীতির অসাধারণ

প্রকাশ। ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে সমগ্র বিশ্ব ইতিহাস ও সভ্যতার বিচার করেছেন তিনি। তাঁর সুগভীর স্বদেশ প্রেমের আর এক জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে। স্বামীজির স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গে একদা ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন,—

'He (Vivekananda) was born a lover, and the queen of his adoration was his mother land.' বর্ত্তমান ভারতের শেষ অনুচ্ছেদে আমরা তাঁর কম্বুকণ্ঠে এই দেশপ্রেমের উদাত্ত ধ্বনি শুনতে পাই,—

"হে ভারত, ভুলিও না--তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিওনা—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিওনা—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিওনা তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিওনা-তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিওনা—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমার মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

ভারতাত্মার চিরজাগ্রত প্রতীক, ভারত ইতিহাসের প্রাণ পুরুষ বিবেকানন্দের লেখনী তাঁর বিশাল হৃদয়ের উত্তাল আবেগে অনিন্দ্য সুন্দর ধ্বনির পরিচয় বহন করছে। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই এমন একটা স্বতস্ফূর্ত্ত প্রাণশক্তির আবেগ আছে যে, পাঠক মাত্রেই অভিভূত হয় এবং এই ক্ষমতা যে কোন কবি-সাহিত্যিকেরই কাম্য সামগ্রী। বিবেকানন্দ ছিলেন এই দুর্লভ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর রচনা সম্পর্কে মহাপ্রাণ গান্ধীজীর একটি উক্তি বিশেষ মূল্যবান Surely Swami Vivekananda's writings need no introduction from anybody They make their own irresistable appeal'

বিবেকানন্দের বাংলা ভাষায় লিখিত পত্রাবলী বাংলা পত্র সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য সংযোজন। সচেতন সাহিত্য সৃষ্টি এগুলি নয়। তবু তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশে এগুলি জীবন্ত হয়ে আছে। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক মহামানবের মত স্বামীজির পত্রাবলীও তাঁর জীবনের অনুভূতি লোকের অনেক গূঢ় সংবাদ বহন ক'রে এনেছে বিবেকানন্দ-মানসের পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য এগুলি অমূল্য উপকরণ। চিন্তার দিক থেকে বেদান্তের মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং জীবনের দিক থেকে কোলকাতার কথ্য ভাষার সঙ্গ—এ দুয়ে মিলে তাঁর চিঠি পত্রের ভাষা গঠিত হয়েছে। সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের অন্তরালে অন্তরঙ্গ বিবেকানন্দের

পরিচয়ও পাওয়া যায় এই পত্রাবলীর মধ্যে। আবার সঙ্গে সঙ্গে আছে কর্মী বিবেকানন্দ, চিন্তাশীল বিবেকানন্দেরও পরিচয়। তাঁর বিখ্যাত 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধটিও উদ্বোধন সম্পাদককে লিখিত একটি পত্রের অংশ। ভাষা সম্পর্কে তার এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটির আদর্শ স্বামীজির পত্রাবলীর মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

কোন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামীজি একদিন বলেছিলেন— Above all, I am a poet', নিজের সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য নিছক আত্মপ্রশস্তি বা তরল ভাবোচ্ছ্বাস নয়। পৃথিবীর অনেক মহামানবের মত তাঁর মধ্যে বিভিন্ন সত্তা। কখনও তিনি দৃপ্ত সংগ্রামশীল কর্মযোগী, কখনও ধ্যানসমাহিত দ্রষ্টা ঋষি, আবার কখনও বা ভক্তি তন্ময় ভাবুক কবি। কবি আমরা কাকে বলব? জগৎ ও জীবনের গভীর উপলব্ধি ভাষায় রূপ দেন যিনি, তিনিই কবি। এদিক থেকে বিচার করলে বিবেকানন্দ একজন বড় কবি। তাঁর হৃদয়ে তরঙ্গিত হয়েছে নিত্য নূতন ভাবের খেলা, জগৎ রহস্য ও জীবন রহস্যের বিচিত্র দিক উদ্বেলিত আলোড়িত হয়েছে সেই তরঙ্গে। আমাদের মহাকাব্যে দেখা যায় গভীর বেদনাবোধ থেকে কবিতার জন্ম।' বাল্মিকী তাই আদিকবি। বিবেকানন্দের অন্তরেও প্রবাহিত হয়েছে মানবের প্রতি করুণার এক নির্বারিণী ধারা। তাই বিবেকানন্দ শুধু কবি নন, মহান কবি। শুধু ভাবের দিক থেকেই নয়, কবিত্বগুণে, লেখার মধ্যেও তাঁর কবি সত্তা ফুটে উঠেছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার এক বিশিষ্ট সংবাদপত্রে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল—

'The Swami Vivekananda is more than teacher, master, philosopher, he is a poet from the land of poetry.....'

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বা নৈতিক সত্যও যে কবির হৃদয়াবেগের রসে অভিসিক্ত হয়ে উচ্চ শ্রেণীর কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের ইতিহাস থেকে তার বহুল প্রমাণ পাওয়া যাবে। বাংলা সাহিত্যেও প্রাচীন যুগের কবি চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই অধ্যাত্ম ভাবনাকে অথবা নৈতিক সত্যকে কবিতায় রূপদান করেছেন। কবিতা তাই কেবলমাত্র স্থূল জীবনানন্দ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহিমা কীর্তন মাত্র নয়, পারমার্থিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধির মধ্যেও কবিতার উপকরণ, আছে আছে প্রকাশ। সংসারত্যাগী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চেতনা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক ও সংগত। কিন্তু কেবল মাত্র পারমার্থিক সত্যোপলব্ধি নয়, লৌকিক জগৎ এবং মানব জীবনের মহিমা ও সৌন্দর্যও তাঁর কবিতায় রসমণ্ডিত হয়ে অপরূপতা লাভ করেছে। 'সখার প্রতি' 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' গাই গীত শুনাতে তোমায়' 'সাগর বক্ষে' প্রভৃতি কয়েকটি মুষ্টিমেয় বাংলা কবিতা স্বামীজি রচনা করেছেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় রচিত তার সঙ্গীত ও কবিতা সমূহ পরবর্তী কালে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত 'বীরবানী' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

'সখার প্রতি' বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা, সংগ্রাম লব্ধ অভিজ্ঞতা

ও নিগূঢ় সত্যানুভূতির উজ্জ্বল রূপ এই কবিতা। মানবজীবনের সব ছদ্মবেশ, শোভনতার অন্তরালে অপার দৈন্যে, অতল অশ্রু নিহিত—এই নিগূঢ় সত্য। এমন নির্মম উপলব্ধি বিবেকানন্দ ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব। বিবেকানন্দে ধ্যানদৃষ্টিতে সমুদ্ভাসিত হয়েছে জগৎ সত্য,

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়
মনপ্রাণ শরীর অর্পন কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

এই মহাভাবের সার্থক প্রকাশে স্বামীজির কবিতা অমর কাব্য-মন্ত্রের মহিমা অর্জন করেছে। তাঁর ইংরেজী কবিতার ভাব বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে জনৈক রসবোদ্ধা সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, His (Vivekananda's) poems are replete with an intimate communion with the very soul of nature, with the spirit that dwells in the rivers, forests, seas, mountains, suns, and stars, commingling to prodnce the most exquisitely artistic and yet spiritual expression—স্বামীজির বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই মন্তব্য সমভাবে প্রয়োজ্য।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন যখন যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে কর্তব্যবিমূঢ়, যুদ্ধবিমুখ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তখন তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন:

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"
"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব"
"হতো বা প্রাপ্স্যসী স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্য স-মহীম
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতানিশ্চয়।"

ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই বানীই ভারবাসীর জীবন দর্শন। সংগ্রামই জীবন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই একমাকর্ত্তব্য, মহাপুণ্য। বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতে প্রাণ পুরুষ, ভারতাত্মার মূর্ত্ত প্রতীক। ভারতবাসী জীবন যুদ্ধের চিরসারথী শ্রীকৃষ্ণের মত তিনি শুনিয়েছেন আমাদের অভয় মন্ত্র। পরাধীন বীর্যহীন, আত্মবিস্মৃত, তমিস্রাচ্ছন্ন জাতিকে নতু আশার আলোকে পথ দেখিয়েছেন, বিশ্বমানবে শ্রদ্ধার আসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতি প্রতি তার কায়িক, মানসিক সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নিঃশেষ ক্ষয়ের জন্য তিনি জীবনের অগ্নিমন্ত্র উচ্চার করেছেন, 'অভীঃ,' বলেছেন, 'বীর ভোগ্যা বসুন্ধর বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে এ কথা ধ্রুব সত্য বীর?—সর্বদা বল "অভীঃ অভীঃ।" আজ তা বিবেকানন্দের রচনা ও বাণীর অনুধ্যানে আমরা এই দৃপ্ত মন্ত্রের বহ্নিতেজ আমাদের অন্তসঞ্চারিত করব। বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে আস বিপর্যয়ের মুখে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে বিকানন্দের কম্বুকণ্ঠে উপনিষদের সেই জাগরণে বাণী আবার ধ্বনিত— উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাবরান্ নিবেধত।" ভয় নাই ওরে ভয় নাই।

নীল সাগরের দেশে

শ্রীধনঞ্জয় নস্কর (৩য় বর্ষ, বিজ্ঞান)

শে ডিসেম্বর—(ট্রেন)

রাতের রহস্যময় অন্ধকারের বুক চিরে একটা
ী ছুটে চলেছে। কয়েকখানা কালো মেঘে
ীর চাঁদ ঢাকা। আকাশের সোনালী
াগুলো পথহারা শিশুর মত করুণ চোখে
বীর দিকে চেয়ে আছে। জনহীন প্রান্তর
ত্রর অন্ধকারে বিলীন, কাল রাত্রির মায়া,
দিকে নিঃস্তব্ধ, অজানা আতঙ্ক, মাঝে মাঝে
কটা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, লাইনের পাশের
গুলো এক একবার উঁকি দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

একটু একটু করে বাংলার সীমানা শেষ। শীত
জমে উঠেছে। হাতের আঙুলগুলো নুয়ে
ছে। শীতে কুঁকড়ে যাওয়া শরীর আর মনটা
ছিল একটু উত্তাপ। সর্বাঙ্গে শালটা জড়িয়ে
পড়লাম, মনের মধ্যে বেশ একটা মনোরম
ভূতি। ···একটু আবেশী ভাব।

·····এখন তোমাদের কোলকাতার কথা মনে
ছে। চারদিক নিওন লাইটের আলো,
সারি দোকান, পার্ক, রেঁস্তোরা, সিনেমা,
ক্রিকেট।

রাত গভীর হয়ে আসছে, কাঁচের জানলার
রে প্রচণ্ড শীত হানা দিচ্ছে। কম্বলের মিঠে
য়ে শরীর আন্দোলিত, চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু।

ঘুম ভাঙল এক বন্ধুর চিৎকারে 'চিল্কা, চিল্কা'
ড় করে সবাই জানলা-দরজা দিয়ে মুখ
বাড়ালাম। গাড়ী ছুটে চলেছে—পশ্চিমে চাঁদটা হেলে পড়েছে।

একজন টিকিটচেকার বল্লেন—জলাশয়টার নাম চিল্কা, বুঝলাম উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে চলেছি—ফিরে এসে আবার কম্বলে আশ্রয় নিলাম।

২৯শে ডিসেম্বর—

ঘুম ভাঙল অনেক দেরীতে—জানলা দিয়ে ফালি ফালি সূর্যের আলো এসে পড়েছে গাড়ীর মেঝেতে—চারিদিকে সোনালী রোদের উত্তাপ—যেন কোন কুমারীর প্রথম চুম্বন--ভয়ংকর শীতলতার সঙ্গে আবেগের উত্তাপ।

গাড়ী ছুটে চলেছে। ধূ ধূ করছে মাঠ। সারা আকাশে মেঘের মেলা, বাতাসে আবেশী সুর। রোদ ক্রমে প্রখর হচ্ছে। অনেক গ্রাম, অনেক জনপদ পেরিয়ে আমরা এসে পৌছলাম ওয়াল-টেয়ারে। মালপত্র সব ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি ভাইজাগের (Visakhapatnam) পথে। সবাই ক্লান্ত—পা তুলতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

তবু অন্তরে উদ্দীপনা ও উৎসাহ, বুকে দুঃসাহসিক পদযাত্রার দুর্জয় আনন্দ। কয়েক মাইল হেঁটে রাজা লজিংয়ে এসে পৌছলাম। আজকের মতো যাত্রা শেষ, আহারান্তে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ছাদে গিয়া বসলাম।

হোটেলটা বেশ। সামনে সাগরের অতলান্ত জল। ওধারে অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের সারি—সুন্দর, শ্যাম, গম্ভীর। প্রকৃতির উজাড় করা যৌবনের তন্ময়তা।

সন্ধ্যার কিছু আগে ছাদ থেকে নেমে এলাম। এবার গল্পের পালা। অধ্যাপকরাও যোগ দিলেন আমাদের গল্পে, ভুলে গেলাম সমস্ত বিভেদ, ভুলে গেলাম তাঁরা অধ্যাপক, আমরা ছাত্র—তাঁরা যেন আমাদের বড় ভাই, আর আমরা তাঁদের ছোট ভাই। জীবনে হয়তো আর কোনদিন তাঁদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কাটাব না। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে আজ যা পেলাম, তা চিরদিন স্মৃতির পাতায় সোনা হয়ে থাকবে। এখন রাত প্রায় বারোটা। কম্বলের মিঠে আশ্রয়ে আসলাম। চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু··· ···এবার শুধু ঘুম।

৩০শে ডিসেম্বর—

ঘুম ভাঙল বেশ অন্ধকার থাকতে। সকলে বলল—সমুদ্র তীরে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া হবে। ·····যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছলাম তখন তারাগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে—সোনালী বালুকা-শয্যায় সাগর তখন নবদিনমনির আগমনী সঙ্গীতে চারিদিক মুখর করে তুলেছে .....আদি-অন্তহীন সাগর। স্নিগ্ধ নীল সমুদ্রের আকাশে জোৎস্না ম্লান হয়ে আসছে—পূর্বাকাশে রক্ত বিন্দুর মত এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। ধীরে ধীরে গলিত সোনার মতো আলোর ধারা সমুদ্র তরঙ্গে মিশে যাচ্ছে। রাত্রির কালো পাথরের উপর রাঙা আলোর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সমুদ্র তরঙ্গ বেলাভূমির কানে কানে গেয়ে চলেছে 'জয় আলোর জয়' ; 'জয় সাগরের জয়"।

ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম "স্পেসিমেন কালেকসানে" (Specimen Collection)। সঙ্গে রইলেন তিনজন অধ্যাপক-কেশব বাবু, ননীবাবু আর নিত্যানন্দ বাবু। সমুদ্র তীর থেকে দুষ্প্রাপ্য জিনিষ খলেতে ভরছি—বজ্রঘোষ গর্জনে সমুদ্রের জল তীরের উপর আছড়ে পড়ছে—আবার ফিরে যাচ্ছে। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ সাগর তরঙ্গের সঙ্গে নাচতে নাচ ত অনেকটা জলে নেমে যাচ্ছে

প্রায় একটায় ফিরলাম হোটেলে। আহারান্তে আবার বেরিয়ে পড়লাম। জেলেদের জাল থেকে অনেক স্পেসিমেন পেলাম, আর কিছু পেলাম সমুদ্র তীরের ছোট ছোট ঢিলা থেকে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোল, হোটেলে ফিরলাম। জল খাবারের পর রাতের আসর জমল। সব ক্লান্তি মন থেকে মুছে গেলো—চারদিকে হাসি আর গান। এবার গাঢ় ঘুম। সকাল হ'তে অনেক দেরী।

৩১শে ডিসেম্বর—

ঘুম ভাঙল 'বেড্‌টী'র সঙ্গে। ডাক এলো তৈরী হও। 'সিমাচলম্' যাওয়া হবে। মনের আনন্দমিশ্রিত অদম্য কৌতূহল ফেটে পড়ল।

বেলা আন্দাজ ১০টায় বাস এসে থামল সিমাচলম পাহাড়ের তলায়। সামনে গগনস্পর্শী নীল পাহাড়। তারই গা বেয়ে এঁকেবেঁকে সিঁড়ি উঠেছে উপরে। পদতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তারই অসমতল কোলে পাহাড়ী গাঁও। এখানেই যান-

াহনের রাস্তা সমাপ্তি ঘটল। এবার আমাদের ায়ে হেঁটে উপরে উঠতে হবে। পাহাড়ের গা বয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছি। আমরা লেছি সীমাচলম্ দেব মন্দির দর্শনে, তিনশত ফুট ঠার পর সকলে ক্লান্ত, সবাই তৃষ্ণার্ত, প্রত্যেকে ায় একটু জল। একটা ছায়া শীতল পৈঠার উপর আমরা বসলাম। নীচে ঝরনার কলধ্বনি। কাছেই একটা ছোট শিব মন্দির। আমাদের সামনে দিয়ে লেছে পূণ্যলোভী যাত্রীর দল। এরা এসেছে ানাদেশ থেকে। যা হোক শিব মন্দিরের পূজারী ামাদের তৃষ্ণা দূর করলেন। এবার বিশ্রাম নয়। কলের শরীরে ফিরে এল উৎসাহ—বহু আশা আকাঙ্খার সীমাচলম্ মন্দিরে পৌছুতে হবে। লতে শুরু করেছি, সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন অপরিচিত যাত্রী। দূর থেকে ভেসে আসছে কাঁসর ন্টার শব্দ; রাস্তা খানিকটা, চড়াই খানিকটা উৎরাই। পা টন্ টন্ করছে। আমরা টলতে লতে চলেছি—জানি না কি আশা নিয়ে চলেছি কি পাব সেখানে। আমরা পাহাড়ের শেষ ধাপে সে পৌঁচেছি, আর মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি বাকী। ই কয়েকটা কোন রকমে উঠতে পারলে আমাদের ক্তি। ভাবতে আনন্দ হচ্ছে পথের হাত থেকে ক্তি পাব। বেশ খানিকটা পরিশ্রমের পর াহাড়ের শেষে পৌছলাম। এ জায়গায়টা সমতল একটু সামনে গিয়ে পেলাম মন্দিরের প্রবেশ পথ। এখানে টিকিটের বিনিময়ে প্রবেশ করতে হয়। খানকার প্রধান দেবতা নরসিংহদেব। এছাড়া ারও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। পূজারীর নির্দ্দেশমত আমরা নরসিংহের মূর্ত্তির চারপাশে াতবার পাক খেলাম। এক অধ্যাপক এই সময় একটু ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললেন—"বাবা, ওদের 'ডিগ্রী কোর্সে' পাশ করিয়ে দিও"। নরসিংহমন্দির থেকে প্রসাদ নিয়ে অন্য সব মন্দির ঘুরে দেখতে লাগলাম—একটার পর আর একটা মন্দির। মন্দিরের ভিতর মূর্ত্তি ছাড়াও মন্দিরের গায়ে পাথর কেটে খোদাই করা অনেক মূর্ত্তি আছে। এগুলো এখানকার প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন—প্রত্যেকটা মূর্ত্তি যেন জীবন্ত। আপন জীবন রস নিঙড়ে শিল্পী সৃষ্টি করেছে এই শিল্প। সৃষ্টির মধ্যে শিল্পী তপস্যা করছে পূর্ণতার। শিল্পী আর শিল্প তাই হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় চারঘন্টা ঘোরাঘুরির পর হোটেলে ফিরলাম। সারা শরীর ক্লান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন। আর কোথায় বেরুতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

১লা জানুয়ারী, ১৯৬৩

উনিশশো বাষট্টি সাল অবসর গ্রহণ করল। তেষট্টির যাত্রা শুরু হোল। আজ বছরের প্রথম প্রভাত। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সুপ্রভাত জানালাম। আকাশ-ভরা অপর্য্যাপ্ত হিরণ্যময় রোদের মেলা। সূর্য্য যেন নতুনভাবে পৃথিবীর কাছে আলোর অর্ঘ্য পাঠিয়েছে! বাতাস-ভরা আনন্দের সুর। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম ভিসাগাপত্তম বন্দরের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ফিরলাম বেলা প্রায় বারোটায়। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে নিলাম।

এবার দেখতে যাব 'ডলফিন নোজ' পাহাড় একটা লাইটহাউস ঐ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আমরা বোটে করে পাহাড়ের তলায় পৌছলাম। লক্ষ্যহীন পর্বতশ্রেণী, উত্তুঙ্গ, কঠিন, পাহাড় কোথা হতে আরম্ভ আর কোথায় শেষ বোঝবার

উপায় নেই। এই পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথ এঁকেবেঁকে উপরে উঠেছে। মনে দুর্জয় আনন্দ, আমরা ছুটতে ছুটতে চলেছি যেন ক্লান্তি নেই—অবসাদ নেই। অদ্ভুত লাগছে এই গতির দ্রুততা। কিছু দূর ওঠার পর আরম্ভ হল খাড়াই পাহাড়। পাহাড়ের চড়াই শুরু হয়েছে, তাই আমাদের গতি হয়েছে ধীর ও সন্তর্পণ—ফসকালেই একেবারে সাগরের জলে··· ক্লান্ত শরীরটাকে একেবারে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে চলেছি। অবশেষে টলতে টলতে কোনরকমে পাহাড়ের মাথায় এসে উঠলাম। এই পাহাড় থেকে সাগরের অনেকদূর অবধি দেখা যায়। দেখলাম সাগরের মাঝখানটা শান্ত, ধীর—অথচ বেলাভূমিকে নিয়েই তার যত দুরন্তপনা। যতদূর দেখলাম শুধু নীল, অনন্ত নীল—অবুঝের মত ভাবছি, পৃথিবীটা কত বড়। হৃদয়ের উদারতাকে দিগন্ত হাতছানি দিচ্ছিল যেখানে সাগরের ও আকাশের নীলিমা একেকার হয়ে গেছে। অন্তরের অনুভূতি ভাষা হবার জন্য হাঁপিয়ে উঠছিল—কিন্তু আমি তখন ভাষা খুঁজে পাইনি। শুধু বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই ভাষারূপ অনুভূতি·····

নীল নীল·····

মাটি গাছ তীর সব একেবারে ফেলে দিয়ে আসা। সুবিশাল ডানা জুড়ে নোনা ঢেউয়ে আলগোছে ভাসা কূল ছাড়া জল আর মেঘতারা হাওয়া নিয়ে খাকা সময়ের নীলে শুধু অবিরাম উদ্দাম আলপনা আঁকা।"

যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সন্ধ্যা হ'তে কিছু বাকী। বিকেলের খাবার খেয়ে হোটেলের ছাদে গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোল। এখান থেকে সাগর দেখা যায়। রাত্রে সমুদ্রের আর এক রূপ। নীল সাগর এখন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। চাঁদের আলো টুকরো টু হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে ঢেউয়ের উপর, আবার গুলো তীরে বিরাটকায় হয়ে বেলাভূমিতে আ যেন ঢেলে দিচ্ছে একরাশ মল্লিকা ফুলের অঞ্জ জনৈক সাহিত্যিক যথার্থই বলেছিলেন—" একমাত্র জিনিষ যাকে মাত্র দশ মিনিটের ব্যব দেখলে মনে হয় জীবনে এই প্রথম দেখছি।"

২রা জানুয়ারী—

বছরের দ্বিতীয় দিন। অনেক দেরীতে ভাঙ্গল। ঘাড়, পিঠ ও কোমর ব্যথা—এটা অনভ্যস্ত অবস্থায় পাহাড়ে ওঠার ফলস্বর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। ভাইজ আজ শেষ সকাল। বিদায়ের ডাক এসেছে। পরে ভাইজাক ছেড়ে চলে যাব। জিনিষ গোছান হচ্ছে আনন্দের মধ্যে কয়েকটা এই লজিংয়ে কেটেছে—এবার ডাক এসেছে প্রাণচঞ্চল মুখর কলকাতার। ঘরটা যেন ক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে—নী সাগর কলকল শব্দে বলে চলেছে—আমাকে ছে চলে যাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদের অন্তরের অনে অংশ অধিকার করে রেখেছি।

বেলা একটার সময় খাওয়া সেরে আম বিদায় নিয়ে ষ্টেশনে যাচ্ছি। হোটেলের ম্যানেজ আমাদের সজল চোখে বিদায় দিলেন। যার জিনিষপত্র হাতে নিয়ে চলেছি শুধু ফেলে এ অপরিচিত স্নেহ, প্রেম, সরল বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা

বিকাল চারটায় আমরা গাড়ীতে উঠলা আবার ট্রেন যাত্রা শুরু করল। মনে মনে সকলে কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায় ভাইজাক বিদায় নীলসাগর। বিদায় পাহাড়তলীর স বন্ধুরা।

অধ্যাপক সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায়

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

হান আমলের ছাত্রদের মধ্যে কেউ-ই বোধ
অধ্যাপক শ্রীসত্যকিংকর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
ন জানে না, কোথাও একবার শোনে-ও নি।
…আশুতোষে কয়েক বৎসর তিনি বাঙলা ভাষা
সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছিলেন, জীবনের শেষ
ক বৎসর যোগমায়া দেবী কলেজে সংস্কৃত ভাষা
সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ-ও অলংকৃত
রছিলেন। যাঁরা তাঁর কাছে একদা পাঠ নেয়ার
ভাগ্য ও সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন
সমাজের কী তিনি ছিলেন, কথাচ্ছলে কী
র্ব্য বস্তু তিনি দান করতে পারতেন; এবং
াপরি কী মহান স্নেহোজ্জ্বল সুন্দর হৃদয়ের
শ্বর ছিলেন তিনি।

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হৃদয়মাধুর্যের (বলব কি প্রবীণ
র সঙ্গে বালকসারল্যের ?) সংমিশ্রণ ঘটলে
ষের ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে অভিনব যে স্বর্গ-
রের আবির্ভাব ঘটে, অধ্যাপক সত্যকিংকর
ন অভিনব সেই স্বর্গসুন্দর দেবচরিত্রের মানুষ।
মানুষ, বলাই বাহুল্য, কোটিতে গোটিক
ই দেখা যায়। বৈশ্যযুগে বৈষয়িক পৃথিবী
-ও যে 'অর্থহীন' সারস্বতসমাজকে সম্ভ্রমের
ব দেখে, শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দর্শন করে
বিস্ময় অনুভব করে—তা এই দেবদুর্লভ মহান
গুলি শুদ্ধ চরিত্রের আবির্ভাবের জন্য বলেই
হয়। বড় মানুষ আমি অনেক দেখেছি কিন্তু
কিংকরবাবুর পাণ্ডিত্য ও প্রেমবৈরাগ্যের অন্ত-
হীন সূর্যচ্ছটার কাছে অনেক জ্যোতিষ্মান বড়কে-ই খদ্যোতের মত নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ বলে' আমার মনে হয়েছে। এ কথা সত্য, দেশের বৃহত্তর সমাজের কাছে সত্যবাবু খুব খ্যাতিমান ছিলেন না, স্থূলদৃষ্টি সহকর্মিবর্গের বিচারে-ও খুব একটা 'সাক-সেস্‌ফুল ম্যান' বলে' তিনি পরিগণিত হতেন না—কিন্তু তাঁর ছাত্রসমাজ ও অন্তরঙ্গমহল জানতেন,—সৌভাগ্যবশতঃ আমি-ও জানতাম, বিধাতার কত বড় আশীর্বাদ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন: কত বড় 'মাথা' ও 'হৃদয়'-এর অধিকারী ছিলেন তিনি।

দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে সত্য-বাবু আশুতোষ কলেজে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে আসেন। …তখন তিনি বড়িষায়—আমার পাড়ার পাশেই, বাসা ভাড়া করে' থাকতেন। সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা হল। ধীরে ধীরে মানুষটির গভীর অন্তরে প্রবেশ করে' দেখি—পূর্বজন্মের বহু সুকৃতির ফলে একজন পরম সারস্বত প্রতিভার সঙ্গেই আমার সখ্য হয়েছে। কী জানেন না অধ্যাপক সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায় ? আরিস্ততেলের নাম করলে পাশ্চাত্য ধর্মী পণ্ডিতেরা যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বোধ করেন, 'বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের নাম মনে হলে আধুনিক বাঙালীর অন্তর-গভীরে যে-ভাব জাগে, সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম স্মরণ করে' সেই শ্রদ্ধা, সেই সম্ভ্রম এবং সেই ভাবের আশীর্বাদ আমি

আস্বাদ করি। কলেজে তাঁর শোকসভার দিন আত্মগতভাবে সুহৃদ্বর শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় যে বলেছিলেন, 'সত্যকিংকর ছিলেন সর্ব-বিদ্যাবিশারদ'—তা' কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয় বলেই আমি জানি।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর অধি-গতি ছিল। হিন্দী ভাষা এত ভালো জানতেন যে, 'ম্যাকমিলান কোম্পানী' তাঁকে দিয়ে একাধিক হিন্দী পুস্তক রচনা করিয়ে নিয়েছিল। তাঁর স্থূল-দর্শী সহকর্মিরাও হয়তো জানেন না, যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে, ইতিহাসে ও অর্থনীতি বিষয়েও তিনি সরস পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হয়েও বন্ধুবর যামিনী মোহন কর নিশ্চয়ই বলবেন,—তিনি একজন বিশিষ্ট গণিতবিদ্ ছিলেন—এবং বন্ধুবর পরেশ সেন-ও জানাবেন যে, পদার্থবিজ্ঞানে-ও তাঁর বিস্ময়-কর অধিগতি ছিল।

ধর্ম ব্যাপারে তিনি একেবারে মোহমুক্ত পুরুষ ছিলেন। স্মৃতির অনুশাসন মানতেন না কিন্তু শ্রুতির ভাবতরঙ্গগুলি সজ্ঞানে প্রতিভাত করতেন চরিত্রে। কত দিন কত রাত্রি কত তর্ক কত আলোচনা তাঁর সঙ্গে আমি করেছি—কৌশলে কত কথা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর তিরোধানে আমি যে কত বড় বন্ধুকে হারিয়েছি, আমিই শুধু জানি।

বয়সে কত বড় ছিলেন—প্রায় দশ বারো বছরের বড় ছিলেন আমার চেয়ে, কিন্তু ব্যবহার করতেন আমার অনুজ-ই যেন তিনি। যে প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি—উত্তর পেয়েছি তৎক্ষণাৎ, অথচ বিদ্যার কোনোরূপ অহংকার ছিল না চরিত্রে।

সংস্কৃত, বাঙ্‌লা, ইংরেজী ও হিন্দী ভা তিনি বলতে পারতেন অনর্গল, লিখতে পার চমৎকার। অনেকে অনেক কিছু তাঁ দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে—কিন্তু পারিশ্রমিক খুব জায়গা থেকেই তিনি পেয়েছেন। অনেকে লেখা নিজের নামে প্রকাশ করে যশ ও অর্থ দুই আত্মসাৎ করেছে—আমি জানি। এর জ তাঁকে কোনদিন কারোর বিরুদ্ধে কোনো প্রব অভিযোগ বা অনুযোগ করতে শুনি নি।

অজাতশত্রু ছিলেন তিনি। তাঁর সদাহাস্য সরল মুখচ্ছবি এবং উজ্জ্বল-উচ্ছল অট্টহাস্য ম পড়ে না—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর অল্পই আ বলে আমার ধারণা।

লেখক হিসাবে—বিশেষ বাংলা গদ্য লে হিসাবে তিনি পরম শক্তিমান ছিলেন। বাংলা গদ্য সর্বাংশে অনুকরণযোগ্য। নাম কর ইচ্ছা ও প্রবণতা থাকলে এখনকার বহু বিখ্য গদ্যলিখিয়ের মন ও খ্যাতিকে তিনি ম্লান ক দিতেই পারতেন।

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে আমি-ই জোর ক কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছিলা প্রবন্ধগুলি ছাত্রপাঠ্য হিসাবে আমাদের 'বা বিচিন্তা' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে— কি আসলে সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য প্রবন্ধ হিসা প্রকাশিত হলেই যেন ভালো হয়। ...একাধি জীবন কথা তিনি সেই প্রবন্ধগুলিতে লিখেছেন 'গৌতম বুদ্ধ', 'অশোক', 'যুগমানব গান্ধী', 'বি

নন্দ', রবীন্দ্রনাথ', নেতাজী বসু'. —প্রভৃতি
ম্বন্ধে সত্যকিংকরবাবুর গদ্য রচনারীতির নৈপুণ্য
দর্শন প্রচ্ছন্ন হয়ে যাছে।

সত্যবাবুর ছাত্রভাগ্য খুব খারাপ ছিল না।
ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত
রময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছাত্র ছিলেন। পাকি-
নের বিখ্যাত কবি জসিমুদ্দীন তাঁর কাছে
বিতা-সংশোধনে আসতেন। লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহি-
ত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর
ছে সাহিত্যপাঠ নিয়ে বিশেষ উপকৃত হতেন
শুনেছি। হাল আমলের একজন জনপ্রিয়
কার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, তরুণ রায় তাঁর
ছ সাহিত্যপাঠ নিতেন বলে জানি।

এই সব কৃতবিদ্য ছাত্র ইচ্ছা করলে সত্যকিংকর-
সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে ও লিখতে পারেন।
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি একত্র করে গ্রন্থা-
র প্রকাশ করার ব্যবস্থাও হয়তো করতে
ন।

অবশ্য সত্যকিংকরবাবু এ-সমস্ত কিছুই যেন
নি। সংসারী হয়েও তিনি ছিলেন সর্ববিষয়ে
সীন। যশ, মান, প্রতিষ্ঠা, অর্থ— কোনো-
ই তাঁর পরিণামদর্শীর দৃষ্টি ছিল না। ...অত
পণ্ডিত, কত বই, কত বিষয়ের বই তিনি
ছন— কত বই কত জায়গা থেকে উপহার
ছেন – কিন্তু বাড়ীতে যান, একখানি বইও
খুঁজে পাবেন না। বই -পত্তর কে কোথায়
গেল, রাখতেন না খোঁজ। অনুযোগ করলে
ন -- বই পড়াটাই আসল কথা, বই সংগ্রহ
কী ছাই হবে? ...নিজের রচনা সম্বন্ধেও
তাঁর ওই কথা। কত কিছু লিখেছেন, কিন্তু
একটাকেও যত্ন করে সঞ্চয় করেন নি। শুনেছি
'বেদান্ত দর্শনের' ওপর একখানি বই লিখেছিলেন--
কোথায় কার কাছে যে দিয়েছেন মনেও নেই।
অলংকার শাস্ত্রের একখানি সুন্দর বই লিখেছিলেন।
সে বই আমি দেখেছি। অত্যন্ত ভালো হয়েছে
বলে মন্তব্য ও করেছি। কিন্তু তাঁর পাণ্ডুলিপি
সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে সেই যে
একদিন রেখে এলেন, তারপর কোনোদিন তা
আর নিয়েই এলেন না। ...সে বইএর পাণ্ডুলিপি
এখন আরআছেকি না কে জানে।

সাহিত্য সমলোচনা তাঁর হাতে খুলত ভালো।
কাব্যের জন্য এমন মিষ্টি ভাষায় তিনি লিখতেন—
এমনি নৈপুণ্য সহকারে বিন্যাস করতেন যে পড়তে
পড়তে মনে হ'ত— স্বতন্ত্র কোনো নূতন সৃষ্টি-ই
বুঝি আস্বাদ করছি।

...কাব্য ভালো বোঝেন বলে, আমরা তাঁকে
কাব্যের ক্লাস নিতে অনুরোধ করলাম। সে বৎসর
কবি মোহিতলালের 'স্মরগরল' বাংলা অনার্স
ক্লাসের জন্য পাঠ্য গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত হয়েছে।
সত্যকিংকরবাবুর ওপর সেই বই পড়ানোর ভার
পড়ল। ভার পাওয়া মাত্র তিনি স্মরগরলের
ওপর দীর্ঘ একখানি ভাষ্য লিখে ফেললেন।
..... আমার ওপর অহেতুক স্নেহ ও বিশ্বাস,
ভাষ্যখানি গোপনে একবার আমাকে দেখতে
দিলেন। আমি তো পড়ে চমৎকৃত হলাম।
ছাপিয়ে দিন, নাম হবে, পয়সাও কিছু পাবেন,
বললাম আনন্দে। তিনি হেসেই আমার কথা
উড়িয়ে দিলেন। তখন মোহিতলাল বেঁচে আছেন

আমাদের গ্রামের একটি পাড়াতেই বাসা ভাড়া করে আছেন। মোহিতলালকে দেখালাম সত্য-বাবুর রচনাটি। মোহিতলাল ধীরভাবে রচনাটি পড়লেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। উচ্ছ্বসিত হলেন বালকের সারল্যে। সত্যবাবুর পরিচয় জানতে চাইলেন। "এমন পণ্ডিত ও রসিক মানুষ যখন বাংলা পড়াতে এসেছেন—তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৌভাগ্য সূচিত হচ্ছে" —বললেন আত্মগতভাবে।

এরপর একদিন সত্যবাবুকে মোহিতলালের কাছে নিয়ে গেলাম। মুগ্ধ কবি সোচ্ছ্বাসে আলিঙ্গন করলেন পণ্ডিত অধ্যাপককে। কবিতে-অধ্যাপকে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কবি তাঁর কাব্যগুলি অধ্যাপককে উপহার দিলেন। বললেন, বেশ মনে আছে—"এতকাল বাদে সত্যকার রসিকের অনুগামিনী হ'ল আমার কবিতা।"

"স্মরগরলের সেই মূল্যবান ভাষ্যখানি কোথায় গেল?" —একদিন জিজ্ঞাসা করলাম সত্যবাবুকে, বছরখানেক পর। "ওই অমুকের কাছে আছে" বলেই অন্যকথা তিনি উত্থাপন করলেন।

—মোহিত লালের কাব্যগুলি একবার আমাকে পড়তে দেবেন?

—আমার কাছে তো নেই।

—কোথায় গেল?

—তা কি জানি। পড়ে ফেললাম, তারপর বইএর সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি?

—সে কি? উপহারের বইগুলি হাত-ছাড়া করলেন?

—না, না, হাত-ছাড়া কেন করব? যে নিয়েছে, নিশ্চয়ই ফেরৎ দেবে।

—কে নিয়েছে?

—তা তো জানি না।

—আমার লেখা বইগুলি?

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে।

—দু-তিনবার করে পড়েছি।

পেলাম স-গর্ব উত্তর।

—তা তো জানি। বাড়ীতে আছে

বাড়ীতে রেখে কি হবে? বই পড়ার জন্যে। বোদ্ধাদের ডেকে ডেকে প দিতে হয়। দিই।

যাদের দেন তাঁরা কি কখনো দেন? দিয়েছেন কখনো?

সত্যবাবু হো-হো করে হেসে উঠ বালকের সারল্যে।

আধুনিক যুগে এমন মানুষ যে প্রতিষ্ঠা পায় পাবে না বলাই বাহুল্য। তবু বিষণ্ণ ব্যথিত আত্মভোলা উদাসীন মানুষের চিন্তাতেই কে যেন শান্তি পায়। লোভ নেই, ক্ষোভ অসন্তোষ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উগ্রবুদ্ধি —আধুনিকযুগে এমন মানুষ যে মাটির পৃথি ওপর দিয়ে পা ফেলে কোনদিন হেঁটে চলে গে চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না।

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেন মশায়ের যেদিন অদ্ভুত এই মানুষটির সম্বন্ধে কথা হচ্ছি অধ্যাপক সেন সত্যকিংকরবাবুকে বিশেষ করতেন। বললেন: সত্যবাবু সম্বন্ধে আমার ধারণা জানেন অমিয়বাবু? তিনি পণ্ডিত ছি

সিক ছিলেন, কবি ছিলেন, সর্ববিদ্যাবিশারদ লেন— সব সত্য। কিন্তু সব থেকে সত্য কথা ই : তিনি 'মহাত্মা' ছিলেন।

অধ্যাপক সেনের মন্তব্যটি অত্যুক্তি বলে সেদিন মার মনে হয় নি। নিষ্কাম আনন্দে কর্ম করে যাওয়ার প্রতিভা আছে যাঁর, কিছু না পেয়েও দিয়ে-যাওয়ার ঔদার্য যাঁর চরিত্রে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার প্রেমানন্দ যাঁর ভাবে ও ভাবনায়, শাস্ত্রে তাঁকেই 'মহাত্মা' বলেছে।

অধ্যাপক সত্যকিংকর মহাত্মা ছিলেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মরণে—

হে চির শাশ্বত, সর্বদা জাগ্রত, বঙ্গদিবাকর,
নিদ্রিত জাতিরে বৎসরে একবার জাগাতে দয়া কর।
উনত্রিশে জুন শুভাবির্ভাব তব করিয়া স্মরণ,
দেশের মাঝে তারা আনিতে শিখুক সবে নব জাগরণ।

কমলাকান্ত বসু
(প্রধান করণিক)

Oh thou Bengal luminary !
always awakened and immortal as thou art,
stir up the sleeping race at least once a year.
In memory of the 29th June,
the date of birth of Asutosh Mukherjee,
let people have new life and activity in the country.

CALCUTTA'
1964

Kamala Kanta Basu
(Head Clark)

গ্রন্থ সমীক্ষা

Bengali Folk-Ballads from Mymensingh and the Problem of their Authenticity by Dr. Dusan Zbavitel, (Published by Calcutta University) Rs. 12·00.

আলোচ্য গ্রন্থটি মৈমনসিংহ-গীতিকা বিষয়ক। গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা; কিন্তু গ্রন্থকার ইংরেজ নন, চেক। লেখক শ্রীদুসান জবাভিতেল চেকো শ্লোভাকিয়া প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যা-ভবনের অধ্যক্ষ। বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে এঁর যোগ ঘনিষ্ঠ। বাংলার পল্লী-সাহিত্যকে ইনি ভালোবেসে আপনার করে নিয়েছেন; মৈমনসিংহ-গীতিকাকে চেক ভাষায় অনুবাদ করে স্বদেশে প্রচার করেছেন, তাছাড়া অপস্রিয়মান পল্লী সাহিত্য উদ্ধারের জন্য পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন এবং সুন্দর সুন্দর বহু বারমাসী গান, মেয়েলি ছড়া, ও পল্লী-গীতিকে কালের গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থখানিও বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি এঁর সক্রিয় শ্রদ্ধার নিদর্শন।

বাঙ্গালীর কাছে এই গ্রন্থটির একান্ত প্রয়োজন ছিল। মৈমনসিংহ-গীতিকা সম্বন্ধে সন্দেহের যে কুয়াশা পাঠকের দৃষ্টিকে এ-যাবৎ ঘোলাটে করে রেখেছিল, বর্তমান গ্রন্থের যুক্তি ও তথ্যের সুতীব্র আলো সেই অন্ধতা নিঃশেষে অপসারিত করেছে; এই খানেই গ্রন্থটির গুরুত্ব।

মৈমনসিংহ-গীতিকা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টির বাস্তবিক কৌতুকজনক। অতি রূপসী অভা হয়—বাংলা দেশে এই রকম প্রসিদ্ধি আ গীতিকারও হয়েছে সেই দশা। গীতিকাগু অপূর্ব সাহিত্যশ্রী যেমন একদিকে রোমাঁ্যা রো মরিস মেটার লিঙ্ক, সিলভাঁ্যা লেভি প্রভৃতি পাশ মনীষীদের মন মুগ্ধ করেছে, তেমনি আবার অ দিকে কয়েকজন বাঙ্গালীর মনে কৃত্রিমতা ও জ য়াতির সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। নবাবিষ্ সন্দেহ দোষের নয় কিন্তু সন্দেহ-বাতি বিপজ্জনক; রবীন্দ্রনাথ 'পরশ-পাথর' কবি দেখিয়েছেন—স্পর্শমণির অন্বেষণকারী সন্ন অন্যমনস্কভাবে আসল মণিকেও নকল সন্দেহ ফেলে দিয়েছিল। গীতিকার ক্ষেত্রেও ঘ ঠিক সেই ঘটনা। বঞ্চনাতঙ্ক-গ্রস্ত বাঙ্গ পণ্ডিতেরা যথোচিত মনোযোগে পরীক্ষা না ক কৃত্রিমতার ভূত দেখেছেন এবং সন্দেহের বিষ-ব ছড়িয়ে দিয়েছেন—যার ফল হয়েছে শোচনী প্রামাণিক 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' মৈমনসি গীতিকা হয়েছে উপেক্ষিত। এর প্রথম সংস্ক সংশয়াত্মক হলেও তবুও যৎসামান্য আলো ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সে-টুকুও আর দেখা যায় তারপর বড় ছোট মাঝারি সব রকম লেখ ছাত্রপাঠ্য শতাধিক 'সাহিত্য-ইতিহাস' প্রকা হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে গীতিকার নামটুকুও কোথাও স্থান পায়নি।

শ্রীজবাভিতেল আমাদের মতো 'কর্তা-ভজা' বাতিকগ্রস্ত নন, ইনি যথার্থ স্বাধীন মনের মানুষ। অবলা পল্লী-গীতিকার প্রতি লাঞ্ছনা কাছে হয়েছে অসহনীয়, তাই প্রকৃত বীরের তা অসহায় অবলার সম্মান রক্ষার্থ এগিয়ে সছেন, প্রমাণ করতে চেয়েছেন— গীতিকার ক্ষে আনীত অভিযোগগুলি অমূলক, অযৌক্তিক অসত্য। বড়ই আনন্দের কথা, বর্তমান গ্রন্থে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। গীতিকা-গ্রহ ব্যাপারে সন্দেহ, গীতিকার ভাষায় ভাষা-ত্ত্বিক সংশয় এবং অভিনব বর্ণনীয় বিষয়ের ভাবিকতা সম্বন্ধে অভিযোগ—প্রতিটিকে ইনি ক্তর দ্বারা খণ্ডন করেছেন। তাছাড়া গীতিকা-লির রচনারীতি, বাগ্‌ভঙ্গি ও অলংকার সম্বন্ধে ণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন— লিতে খাঁটি লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই আছে, লি থেকেও গীতিকার অকৃত্রিমতার প্রমাণ ।

আলোচ্য গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য—উদ্দেশ্যমূলকতা-তিক্রমণ ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে চিন্তা-বিস্তার। নৈমন-হ-গীতিকার কাহিনী, কবি ও ভণিতা হিন্দু-লমানী উপাদান প্রভৃতি ব্যাপকতর বিষয়ে ত্তাপূর্ণ আলোচনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। আরও বৃহত্তর গভীরতর আলোচনার সূত্রপাত আছে। হিত্যের দ্বিবিধ রূপ---শিল্প-সাহিত্য (art litera-re) ও লোক-সাহিত্যের (folk literature) শিষ্ট্য ও পার্থক্য, দেশভেদে লোক-সাহিত্যের দ,পাশ্চাত্যে লোক-সাহিত্যের বিলুপ্তি ও প্রাচ্যে জীবনের কারণ, শিল্প-সাহিত্যের উপর ক-সাহিত্যের প্রভাব প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

দুঃখের বিষয়, আনুষঙ্গিক আলোচনায় লেখকের মতের সঙ্গে সর্বত্র একমত হওয়া যায় না। কারণ, লেখক এখানে বিশেষ মতবাদের মধ্য দিয়ে দেখেছেন বলে সত্যের যথার্থ চেহারা দেখতে পাননি। গোড়াতেই ধরে নিয়েছেন— ক্ষমতা-প্রিয়তা, শোষণ ও উৎপীড়ন ধর্ম মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য, ধর্মের জবরদস্তিতেই ভারতের শিল্প-সাহিত্য হয়েছে ধর্মদাস এবং তার প্রতিক্রিয়াতেই হয়েছে বিদ্রোহী লোক-সাহিত্যের জন্ম; ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য তাই দেবতা-কেন্দ্রিক এবং লোক সাহিত্য মানব-মুখী; বাংলাসাহিত্যে প্রথমটির দৃষ্টান্ত মঙ্গল কাব্য এবং দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত মৈমন-সিংহ গীতিকা। এই হচ্ছে সংক্ষেপে শ্রীজবাভিতেলের থিয়োরী। ভারতের ক্ষেত্রে এই থিয়োরী অবাস্তব বলেই প্রতিবাদ-যোগ্য।

ব্যক্তিগত ভোগসুখই সর্বত্র ক্ষমতা-লুব্ধতা, শোষণ ও উৎপীড়নের মূল কারণ। এই ভোগসুখ ঐহিকই বটে। এই ঐহিক ভোগসুখ কখনো হিন্দুধর্মের আদর্শ নয়। হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি বৈরাগ্য। হিন্দুর ধারণা ইহজগৎ দুঃখময়— "দুঃখালয়মশাশ্বতম্" (গীতা ৮/১৫)। এই বাণী যদি লোক-ঠকানো কথা হতো, শঠতা হতো, তাহলে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানন্দ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মগুরুরা খ্রীস্টান ধর্মগুরু পোপেদের মতো রাজোচিত ভোগ বিলাসে জীবন যাপন করতেন; কিন্তু জীবনে এঁরা প্রকৃতই কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী দুঃখব্রতী সন্ন্যাসী। যে ধর্মে বৈরাগ্যই আদর্শ সে ধর্মের শোষণ বা উৎপীড়নের কথা ওঠে না। এ থেকেই বুঝা যাবে যে ধর্মের পীড়নে প্রতিক্রিয়া

রূপে লৌকিক সাহিত্যের জন্ম এখানে হয় নি। ভারতে ধর্ম-সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নয়, পরিপূরক রূপে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই জন্মগ্রহণ করেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে, ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকল সামাজিক মানুষের দ্বৈত মনোবৃত্তি এর মূল কারণ—একটি সামাজিক অপরটি অসামাজিক; একটি কল্যাণ-কামী, অপরটি সৌন্দর্য-কামী; একটির বিকাশ ধর্ম-সাহিত্যে, অপরটির প্রকাশ লৌকিক সাহিত্যে। সংস্কৃত ভাষায় প্রথমটির দৃষ্টান্ত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ; দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা, অমরুশতক। বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ধর্মসাহিত্য এবং পদ্মাবতী, বিদ্যাসুন্দর লৌকিক সাহিত্যের নিদর্শন। এদের কোনটিই তথা-কথিত প্রতিক্রিয়ার ফল নয়।

শিল্প সাহিত্যের পাশাপাশি লোক সাহিত্যের যে উৎপত্তি হয়েছে তারও মূলে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। অপরিণত মন পরিণত মনের আনন্দ আস্বাদ করতে সক্ষম হয় না— এই অক্ষমতাই লোক সাহিত্য সৃষ্টির সহজ কারণ। বলা বাহুল্য লোক সাহিত্য কেবল লৌকিক সাহিত্য নয়, এখানেও ধর্ম-সাহিত্য আছে। সাপের মন্ত্র, ভূত-ছাড়ানো মন্ত্র, শিবের গাজনের ছড়া প্রভৃতি এই লোক সাহিত্যের অন্তর্গত ধর্ম সাহিত্যেরই আদিম রূপ। লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের কথা— ভারতে কোনকালেই গণ-শিক্ষা নেই—অধিকাংশ লোক চিরকালই অশিক্ষিত — তাই তারা শিল্প সাহিত্যের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত। এখনো তাই রবীন্দ্র-নাথের গানের পাশাপাশি লোক সাহিত্যের কবিকে গাইতে শোনা যায়—

কী কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানি
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি সজনী!

আর একটি কথা— মঙ্গল কাব্যকে পৌরা সাহিত্য এবং "শিল্প সাহিত্য" রূপে অনে ভুল করেন এবং বর্তমান গ্রন্থেও সেই ভুল হয়েছে। আসলে মঙ্গল কাব্যও অপরিণত মানসের সাহিত্য। প্রাকৃতিক শক্তি স আদিম মনের আতঙ্ক থেকেই মনসা, শী ধর্ম ঠাকুর প্রভৃতি মঙ্গল-দেবতার জন্ম। হিন্দু ধ বৈরাগী মনোবৃত্তি বা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে দেবতাগুলির কোন সম্পর্ক নেই, মহত্ত্ব বা মা কিছুই নেই এই জন্য এঁরা কোন ধর্ম সম্প্রদ সৃষ্টি করতে পারেন নি। আসলে এঁরা জন-মনে দেবতা, পৌরাণিক দেবতা নন। তাই মঙ্গল-ক কেবল ইহলৌকিক লাভালাভেরই খতিয়ান যায়। তাছাড়া রন্ধন-তালিকা, গাছের তালি হনুমানের বীরত্ব, কাঁকড়া-দহ, জোঁক-দহ, ঠেঙ্গের দেশ প্রভৃতি আজগুবি কথার বাড়া থেকে প্রমাণ হয় মঙ্গল কাব্যগুলি অপরি মনেরই সাহিত্য অর্থাৎ লোক-সাহিত্যই বটে।

এ সব কথা কিন্তু অবান্তর কথা মাত্র, এ গ্রন্থের আসল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এই র তুচ্ছ আনুষঙ্গিক ত্রুটির জন্য জবাভিতেলের গ্র মূল্য কমে না। আমাদের মূল কথা ভুললে চ না। সে কথাটা হচ্ছে— বুদ্ধির দোষে আ মৈমনসিংহ গীতিকার মতো রত্নকে হারিয়েছি আলোচ্য গ্রন্থ সেই হারামণিকে উদ্ধার এনে দিয়েছে।

এই গ্রন্থখানির জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জ শ্রীজবাভিতেলের কাছে কৃতজ্ঞ।

—তারাপদ ভট্টাচা

বাঙালীর সাহিত্য – (আদি, মধ্য ও আধুনিক
) শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় এম, এ, অধ্যাপক,
শুতোষ কলেজ। দি বুক একসচেঞ্জ, ২১৭,
ধানসরণি, কলিকাতা-৬। ছয় টাকা।

বাংলা সাহিত্যে আজ আর বাংলা সাহিত্যের
তিহাসের অভাব নেই। শুধু নতুন লেখকদের
ত্য আবির্ভাবই নয়, একই লেখক দিনের পর
ন একই বিষয় বস্তুকে একটু অভিনব পন্থায়
ঠকদের বিশেষ করে উদ্‌ভ্রান্ত ছাত্র সমাজের
মনে তুলে ধরছেন। কিন্তু সে সব রচনার
শির ভাগকেই সত্যিকারের সাহিত্যিক দান
সাবে স্বীকার করে নিতে যথার্থ কারণে
নেকেই কুণ্ঠা বোধ করবেন। এর মধ্যে যে
জন লেখক আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাহিত্য
নায় চেষ্টিত আছেন, সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক-
ন তাঁদের চিনতে ভুল করবেন না। অধ্যাপক
অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় তেমনি একজন
াহিত্যিক।

গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করে বহু প্রামানিক
ন্থের উপর নির্ভর করে বর্ত্তমান পুস্তকখানা
খেছেন। অনেক তথ্য একত্র সন্নিবেশিত
য়েছে। ভাষা স্বচ্ছ ও সরল। বাঙালী পাঠকের
হিদা মিটবে বলেই আশা করি।

কত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে শিল্পী দৃষ্টি ভঙ্গি
য়ে বাংলা সাহিত্যের আদি, মধ্য ও আধুনিক –
ই তিন যুগের বিরাট ইতিহাসকে উপস্থাপিত
রা যায় এ গ্রন্থটি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।
ল্প কথায় তিনি বুঝিয়েছেন অনেক। কোন অনাবশ্যক ব্যাপ্তিও এখানে নেই। কারণ 'সারতত্ত্ব-টুকু পরিবেশন' করাই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে তিনি তদানীন্তন সমাজ জীবনের অনুসন্ধান করেছেন। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের আলোচনায় বিশেষ করে চৈতন্য চরিতা-মৃতের আলোচনায় 'একটি শুচিসুন্দর নির্মলমনের সূর্য দীপ্তি প্রত্যক্ষ করি'। চৈতন্য চরিতামৃতের এমন সুচিন্তিত এবং আকর্ষনীয় আলোচনা এ গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছে, সন্দেহ নাই। পদাবলীর তত্ত্ব, বাউল গানের অর্থ আর কবি গানের ধর্ম ব্যাখ্যায় যেমন নিষ্ঠার পরিচয় পাই, তেমনি পাই ইতিহাস কারের চিন্তা-স্বাতন্ত্র্য ও দৃষ্টি ভঙ্গির অভিনত্ব। আধুনিক পর্বের আলোচনাটি আরও বিস্তৃত; গ্রন্থটির প্রায় অর্ধেক জুড়ে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন – বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বংকিম সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমরা আশা করছি।

ভুমিকায় অধ্যাপক বন্ধু যথার্থই বলেছেন, বাঙালীর সাহিত্য··· তিন যুগের সাহিত্য ইতিহাস। ··· বলাই বাহুল্য, সাহিত্যের ইতিহাস শুধু সন তারিখের তর্ক বিতর্ক নয়, সন তারিখ বিহীন রূপ-কথা বা গল্প কথা নয়, আবার সাহিত্য রস বিহীন পাণ্ডিত্যাভিমানী-তথ্য-সর্বস্বতা ও নয়। সাহিত্য কী বস্তু, সাহিত্যিকরা কেমন, সাহিত্য দৃষ্টির মাধ্যমে ভাষা, সাহিত্য, জীবন, সমাজ তথা দেশের এমন কি বিশ্বের, কী কল্যাণ তাঁরা সাধিত করেছেন—জাতির জাগরণে, নব জীব উদ্ভাবনে

নব জীবনের ও চেতনার দার্শনিক তত্ত্বাদি প্রকটনে সাহিত্যিকও কবিরা মানব জাতির চলার পথে কতটা অবদান জুগিয়েছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা তার প্রকাশ দেখতে চাই।

অধ্যাপক বন্ধু এ বিষয়ে একটি প্রথম শ্রেণি রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। সার্থক শিল্পী তি তাই এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—সত্যরঞ্জন ব

সাহিত্য সাধক বিবেকানন্দ—অধ্যাপক ডাক্তার অধীর দে। স্বস্তি প্রকাশনী, কলিকাতা-৩৪। মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

ডঃ অধীর দে ইতিমধ্যেই তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ "আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা" প্রকাশ করে বাংলার সমালোচক সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। "সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দ" তাঁর পূর্বখ্যাতি আরো বর্ধিত করবে।

স্বামীজির জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একাধিক ভালো বই বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে 'সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দ' একখানি ভালো বই, পড়বার মত বই, ইস্কুলকলেজের লাইব্রেরীতে এবং ব্যক্তিগত পাঠাগারে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখার মত বই।

স্বামীজি একজন প্রথমশ্রেণীর ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী ছিলেন, স্বদেশকর্মী ছিলেন, দেশনায়ক ছিলেন, ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানদার্শনিক—এ সমস্ত তথ্য বর্তমানে প্রায় সকলেই জানেন; কিন্তু তিনি যে একজন প্রথমশ্রেণীর গদ্য লিখিয়েছিলেন, ছিলেন সাহিত্যিক ও কবি, কবিদের কবি ক্রান্তদর্শী—এ তথ্য আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে কেউ জানতে চান নি—নির্জন মন্দিরে কেউ যদি জেনেও থাকেন, ভেবেও থাকেন, কষ্ট করে জনসমাজে তা প্রকাশ কর প্রয়াস করেন নি।

ডঃ শ্রীমান্ অধীরের সাহিত্য-পাঠক এ-দিক থে বাঙলাসাহিত্যের একটি মস্ত অভাব পূর্ণ করল।

ডঃ অধীর এই স্বল্পায়তন গ্রন্থে স্বামীজি সাহিত্যিক ও কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দ করেছেন এবং স্বীকার করতে খুবই আনন্দবো করছি যে, সর্বাংশে তিনি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন

গ্রন্থখানিতে চারিটি অধ্যায় আছেঃ ব্যা পরিচিতি; আবেগ ও কবিত্ব; মনন ও ব্যক্তি ভাষা ও বাণীভঙ্গী।

চারিটি প্রবন্ধই সুলিখিত। ব্যক্তি-পরিচি তথ্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ রচনা। এই একটি মাত্র প্র পড়েই স্বামীজির জীবন ও কর্ম-কীর্তি সম্ব অনুসন্ধিৎসু পাঠক সুস্পষ্ট ধারণা করে নি পারবেন। গ্রন্থকার যে একজন উচ্চশ্রেণি সাহিত্য-গবেষক—এই প্রবন্ধেই তা পূর্ণ নৈপুণ্যে প্রকটিত হয়েছে। 'আবেগ ও কবিত্ব' এবং 'মন ও ব্যক্তিত্ব'—এই দুটি প্রবন্ধ লেখকের অন্তদৃ এ গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। 'ভাষা বাণীভঙ্গী' প্রবন্ধে লেখক অনেক নূতন তথ্য স

শিত করেছেন। প্রবন্ধটি অবলম্বন করে স্বতন্ত্র
টি সুদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

লেখকের শ্রম, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও নিরপেক্ষ চিন্তা
মাকে মুগ্ধ করেছে। অনেকস্থলে আমি গ্রন্থ-
নি দার্ঘ দিয়ে দিয়ে পড়েছি।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জীটি থাকায় ভাবীকালের বিবেকানন্দ-গবেষকদের খুবই উপকারে আসবে।

সাহিত্যপাঠক বাঙলার পাঠকমহলে সমাদৃত হ'ক—এই আমার কামনা।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন

॥ ছাত্র-সংসদ বার্তা ॥

দিনান্তে ছোট্ট মুদিখানার মালিক যেমন তার সারাদিনের বিকি-কিনির হিসাব মেলাতে—হিসাবের খাতা খুলে বসে, আমাকেও তেমনি পত্রিকা সম্পাদকের তাগিদে একটি বছর ধরে যা করেছি তারই হিসাব মেলাতে সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে।

জবানবন্দীর প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, বার্ষিক প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব আমার নয়। অনিবার্য কারণে, সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রবীর সেনগুপ্ত দায়িত্ব ভার ত্যাগ করায়, স্বাভাবিক নিয়মেই আমাকে এ কাজ করতে হচ্ছে।

বার্ষিক নির্ব্বাচনের পর যথার্থ দায়িত্বভার হাতে পেতে না পেতেই কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির যাত্রা হ'ল শুরু। সেই কারণে, বলা বাহুল্য প্রথম পর্যায়ে আমাদের পক্ষে বিশেষ কিছু ক'রে ওঠা সম্ভব হয় নি।

নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনায় অন্যান্য বারের মত যথারীতি এবারেও আমরা এক স্বাগত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবাগত ছাত্রবন্ধুদের অভিনন্দন জানাই।

আশুতোষ, যোগমায়াদেবী ও শ্যামাপ্রসাদ কলেজের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সম্মিলিত ভাবে এবারেও আমরা ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মোৎসব, ২৬শে জানুয়ারীর সাধারণতন্ত্র দিবস, ও সরস্বতী বাণী অর্চ্চণার আয়োজন করি।

গত ১৫ই ডিসেম্বর আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে আমাদের প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ কৃষ্টি সম্পাদকের প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রপাঠচক্র, ভূগোল-সংসদ ও বায়োলজিক্যাল সেমিনারকে এবারে আমরা একশত টাকা করে অর্থ সাহায্য দিয়েছি। স্বীকার করি প্রয়োজনের তুলনায় এ সাহায্য যদিও সামান্য তবুও নানা কারণে আরো বেশী দেওয়া সম্ভব হয় নি। আগামী ছাত্র সংসদকে এ সম্পর্কে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

ছাত্রবন্ধুদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সংসদের প্রযোজনায় যে 'চীপ ক্যান্টিন' রয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রস্তাব না করে পারছি না। আমার বিশ্বাস—আশুতোষ, যোগমায়া ও শ্যামাপ্রসাদ এই তিন বিভাগের চীপ ক্যান্টিনের পরিচালনার দায়িত্বভার যদি একই পরিচালকের হাতে দেওয়া যায়, তা হলে আরো অনেক সস্তায় ভাল খাবার পাওয়া সম্ভব হবে। এ বিষয়ে তিন বিভাগের কলেজ কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আমাদের 'চীপ স্টোরের' অগ্রগতি অব্যাহত য়ছে ছাত্রবন্ধুদের যাতে আরো সস্তায় খাতা-র, বই ইত্যাদি দেওয়া যায়—সে সম্পর্কে লক্ষ্য খেছি।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখতে বাধ্য হচ্ছি, র্তমান বর্ষে অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুন, এবারে id-Fund থেকে ছাত্র বন্ধুদের যথেষ্ঠ পরিমান াহায্য দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আগামী বর্ষে য়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ করে Aid-Fund থকে ছাত্র বন্ধুদের যাতে কিছু সাহায্য দেওয়া ায়—সে সম্পর্কে নবাগত ছাত্র-সংসদকে সজাগ ষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

গত ১০ই জানুয়ারীর সামান্য হাঙ্গামাকে কেন্দ্র রে পুলিশের গুলিতে অন্যায় ভাবে নিহত দীন-ন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের ছাত্র শ্রীভূদেব সেনের মৃত্যুর নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করি আমরা। জাতীয় স্বার্থে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি র্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাকে অক্ষুন্ন রাখতে এর প্রয়ো-জনীয়তা—অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ এই দাবিতে গত মার্চ্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খ-লতার—ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করি আমরা।

আমরা এ বৎসর ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সরকারী শিক্ষা সংকোচন নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্রের কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের পথকে উন্মুখ, করবার দাবি জানাচ্ছি। সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত দ্বাদশ বার্ষিক কোর্সের বিরোধিতা করছি। কারণ, এই প্রথা শিক্ষা সংকোচন নীতির সহায়ক হবে। এবং আমি আগামী ছাত্র সংসদকে সুস্থ শিক্ষা জীবনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলবার অনুরোধ করছি।

ছাত্র-সংসদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন, উপাধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য ও সংসদ সভাপতি অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে আমার হৃদয়ের গভীর প্রণাম জানিয়ে প্রতিবেদনটি শেষ করছি।

॥ ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ ॥

—বিধান চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সাধারণ সম্পাদক

॥ বিতর্কের আসর ॥

বিতর্ক সম্পাদক রূপে দায়িত্ব ভার হাতে নিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে অনুভব করেছি—আমাদের কলেজের বিতর্কের মান পূর্বের তুলনায় বেশ কিছুটা নীচে নেমে গেছে। অবশ্য, এর মূলে কলেজে সুবক্তার অস্তিত্বের অভাব তা নয়, মূলতঃ সুষ্ঠু কর্ম প্রচেষ্টার অভাব বলা যেতে পারে। সুতরাং এ দিকে দৃষ্টি রেখে বিতর্ক প্রতিযোগিতার সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছি।

এবারে আমাদের আন্তঃ শ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃতীয় বর্ষ : সাহিত্য), অঞ্জন বসু (প্রথম বর্ষ : সাহিত্য) ও বরুণ গাঙ্গুলী (প্রথম বর্ষ : বিজ্ঞান)।

নিখিল বঙ্গ আন্তঃ কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে আমরা সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজ, বেঙ্গল ভেটানারী কলেজ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ (মুর্শিদাবাদ), শরৎ বসু একাডেমী, ডঃ হরেন্দ্র মুখার্জ্জী শীল্ড ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছি। এই সব প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন—সর্ব্বশ্রী জয়ন্তকুমার রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ সেন, সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর সেনগুপ্ত, মানবেন্দ্র সান্যাল, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঞ্জন বসু।

এ ছাড়া গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে মহাজাতি সদন হ আয়োজিত এক সভায় "বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান" সম্পর্কে আমাদের কলেজের থেকে ভাষণ দেন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বা বিভাগের সাম্মানিক ছাত্র জয়ন্তকুমার রায় অমিত গঙ্গোপাধ্যায়।

ছাত্র সংসদের প্রযোজনায় আন্তঃ কলেজ বি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান গত ফেব্রুয়ারী ম করার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদা হাঙ্গামার জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আ করি এই প্রতিযোগিতা যাতে আগামী অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে নব-নির্ব্বাচিত সম্প লক্ষ্য রাখবেন।

এই এক বৎসরের বিভিন্ন কর্মধারার অভিজ্ঞ একটি বিতর্ক পরিষদের অভাব অনুভব করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র বিতর্ক পরি মাধ্যমেই—বিতর্কের মানোন্নয়ন সম্ভব। প্রত রাখি, এ সম্পর্কে আগামী ছাত্র সংসদ দৃষ্টি দে

নানা প্রয়োজনে, সাহায্যের দাক্ষিণ্য এগিয়ে আসায় আমার সহকারী— শ্রীমি মুখার্জ্জীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

— প্রাণতোষ বন্দ্যোপ
বিতর্ক সম্প

কমন-রুম ॥

সম্পাদকের দায়িত্ব ভার হাতে নিয়ে প্রথমেই ত্র ছবি করকবলিত কমনরুমকে, পরিমিত ক ছবির সমন্বয়ে আরো আকর্ষনীয় করে তুলি।

ছাত্র বন্ধুদের জন্য প্রতিবারের মত এবারেও লা, ইংরেজী ও হিন্দী বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, ক্ষিক ও মাসিক পত্র পত্রিকা আনার ব্যবস্থা াহত রয়েছে।

এবারে আমরা আন্তঃ কলেজ টেবিল টেনিস তযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে—অনন্য ক্রীড়া পুণ্যে বিজয়ীর সম্মান লাভ করলেও সামান্য বধনতায়, আইন গত বিচ্যুতির ফলে উক্ত ান লাভে বঞ্চিত হই। পাটনায় অনুষ্ঠিত India Moinul Hague Table Tennies urnament এ এবারেও আমরা বিজয়ীর সম্মান করি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ নিয়ে পর দু'দুবার আমরা এই সম্মানে ভূষিত হয়েছি তবারের মত এবারেও Inter section Indoor nes competition এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, বর্তমানে তা প্রায় সমাপ্তির পথে।

কমনরুম স্থিত ছাত্র সংসদের প্রাচীর পত্রিকা কলেবরে নতুন নামে (সূর্যশিখা) বন্ধু প্রবর কালীকৃষ্ণ গুহের সম্পাদনায় যথারীতি প্রকাশিত হয়। সূর্যশিখার আরও দ্রুত প্রকাশনা বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে আশা করি আগামী ছাত্র-সংসদ দৃষ্টি দেবেন।

সম্প্রতি গত দু'বছর হতে কমন রুম কাণ্ড থেকে বিতর্ক সংস্থাকে অর্থকরী সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে, এ রীতি অবিলম্বে বন্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

বিদায় নেবার আগে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের ছাত্র সংখ্যানুযায়ী কমন-রুমের আকার পর্যাপ্ত নয়। ফলে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে ঐ সং-কীর্ণ ঘরে দু'টো টেবিল টেনিস বোর্ড, কেরাম ইত্যাদি খেলাধুলো এবং একই সঙ্গে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, পূর্বের মত শুধু পড়াশুনার জন্যই তাঁরা যেন কলেজ হলের ব্যালকনি ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করেন।

সবার শেষে, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সংসদ সভাপতি এবং কমনরুমাধ্যক্ষকে আমার প্রণাম ও ছাত্রবন্ধুদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে—বিদায় নিচ্ছি।

—গঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
কমন রুম সম্পাদক

॥ ক্রীড়া-দপ্তর ॥

কলেজীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণে আশুতোষ কলেজের একটা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। বলা বাহুল্য, সেই স্বাতন্ত্র্য—গৌরবময় ইতিহাসের। ক্রীড়া-সম্পাদকের দায়িত্ব ভার হাতে নিয়ে, সেই গৌরবময় ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছি।

গতবারের মত এবারেও আমরা হকি লীগ প্রতিযোগিতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে পরাজিত করে লীগ চাম্পিয়নের সম্মান লাভ করেছি। এবং হকি নক-আউট) প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছি।

এবারে আমদের ফুটবল দলে ছিলেন এস, সনাজপতি, কে সরকার, বি দেবনাথ, সি ব্যানার্জী, এ ব্যানার্জী, বি রায় চৌধুরী, এন সরকার, বি চ্যাটার্জী, কে দত্ত, আর গুহ, এস ভট্টাচার্য বি ব্যানার্জী প্রমুখ প্রখ্যাত খেলোড়বৃন্দ। আমরা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে ইলিয়াট শীল্ড লাভ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ হেরম্ব মৈত্র শীল্ডে বিজয়ীর সম্মান লাভে বঞ্চিত হই।

ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আমরা বর্তমানে কোয়াটার ফাইন্যাল পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আশা করি, ক্রিকেটে আমরা, আমাদের পূর্ব ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হব।

আন্তঃ কলেজীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগি আমরা যদিও ফাইন্যালে চারুচন্দ্র কলেজের ক পরাজয় বরণ করেছি, তবুও একথা স্বীকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এই খেলাটি উপস্থিত দ বৃন্দের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকজন খেলোয়াড় কলিক বিশ্ববিদ্যালয় দলে স্থান লাভ করে, আমা কলেজের সম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

আমাদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ফেব্রুয়ারী মাসে কলেজের নিজস্ব মাঠে অনু হয়েছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারে বি বিষয়ে প্রতিযোগীদের স্বল্প সংখ্যক উপ অনেকেরই চোখে পড়ে। এ বিষয়ে ছাত্রবন্ধু দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রীড়া বিভাগের ভার অধ্যাপকগণ তাঁদের সহৃদয় প্রযত্ন নিয়ে এ এসেছেন। এজন্য অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্র অধ্যাপক বি ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পি রায় ও অধ্য পি রায় চৌধুরীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নি করি। এই প্রসঙ্গে আমার সহকারী, ছা মহেশ সাহা ও শ্যামল রায়কে কৃতজ্ঞতা জা শেষ করছি।

—আশুতোষ
সম্পাদক : ক্রীড়াবি

॥ আশুতোষ কলেজ ছাত্রাবাস ॥

বসন্ত বোস রোড, কলিকাতা-২৬

মহাকালের মহাযাত্রাপথে, বিচিত্র ধ্বনি মুখরিত ছ'টি ঋতুর আরেকটি পরিক্রমা সম্পূর্ণ হল—ছাত্রাবাসের জীবনে। ছাত্রাবাসের আটচল্লিশটি হৃদয়ের আকাশ, আরেকবার প্রশস্ততর হয়ে, নিঃশেষে মিলে মিশে যেতে চাইল, মহাবিদ্যালয়ের দ্বিসহস্র তারুণ্য-দীপ্ত প্রাণের সাথে। নিবিড় করে পেতে চাইল তাদের আনন্দ বেদনাকে, আর জ্ঞান সাধক অধ্যাপকদের চরণতলে জীবন-প্রশস্তির পাঠ নিল বিনম্র ও প্রণত হৃদয়ে।.....

যাক্। এবারে আমাদের ঘরের কথায় আসি। এ বছরে আমাদের আবাসিকদের পরীক্ষার ফল—আশানুরূপ ভাল-ই। শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক শ্রীপ্রমথেশ রায় মহাশয়ের সুপরিচালনায় অন্যান্যবারের মত এবারেও আমরা—১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা দিবস, ২৬শে জানুয়ারীর সাধারণতন্ত্র দিবস, এবং মহানায়ক নেতাজীর জন্ম দিবস সাফল্যের সঙ্গেই উদ্‌যাপন করেছি। ফুটবল খেলায় আমরা আমাদের নূতন ছাত্রাবাস (কালীঘাট রোড) দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছি; এবং আমাদের মিলনের সূত্রটাকে এই সঙ্গে আরো নিবিড় ও দৃঢ় করে তুলেছি।

পরম পূজনীয় অধীক্ষক মহাশয়ের মমতামেদুর হৃদয়ের যে অপরূপ বার্তা, আমাদের কাছে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে তাঁর প্রতিটি কাজে, পদক্ষেপে—তাকে ভাষায় রূপ দেওয়া সত্যই কঠিন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে ছাত্রকুল যেন আরো সুদীর্ঘকাল ধরে দেশ ও দশের মুখোজ্জ্বল করে—ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করি।

ছাত্রাধিনায়ক মনোরঞ্জন রায়, এবং সাধারণ সম্পাদক প্রবীরকুমার বসু তাঁদের কর্তব্য পালনের অনলস প্রয়াসে অতুলনীয়। এ জন্য তাঁদেরকে, আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ধন্যবাদ জানাই।

পিছনে পড়ে রইল সূর্যাস্তের রশ্মিরাঙা যূথিকা। সামনে কুঞ্জবন চেয়ে রয়েছে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে আদিত্যের অমলিন নেত্র পাতের প্রত্যাশায়। প্রার্থনা করি তাঁর দৃষ্টিপাতে সমগ্র মাতৃভূমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক শত শত শ্বেত যূথিকায়; ফলপ্রসূ হ'ক আমাদের সকল কামনা ও বাসনা। মুক্ত হ'ক আমাদের সকল জড়তা ও বন্ধন।

— গৌরমোহন সাহা
কমনরুম : সম্পাদক

॥ আশুতোষ কলেজ নতুন ছাত্রাবাস ॥

কালীঘাট রোড্

আক্ষরিক মহাকালের মহীরুহ থেকে
খসে পড়ল একটা পাতা,
বিদায় নিল একটা বছর।

নতুন বছর এলো, জীর্ণ গাতায় সঞ্চারিত হলো কিছু স্মৃতির মর্ম্মর ধ্বনি। সে ধ্বনি আমাদের কাছে কখনো হতাশার কখনো আনন্দের।

বছরের শেষে কোলকাতায় ও আমাদের প্রতি বেশী দেশে নিরীহ মানুষের জীবনের ওপর হিংসার ঝড় বয়ে গেছে। সেই 'ক্রন্দনময়' অধ্যায়ে প্রার্থনা করেছি এই "হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী"তে এসো, "শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য করুণাঘন, ধরণী-

তল কর'কলঙ্ক শূন্য।"

আমাদের অধীক্ষক মহাশয় সেই "কুটিল অধ্যায়ে" শান্তি ও সহনশীলতার আদর্শকে সক্রিয়তা দানের চেষ্টা করেছিলেন। আমরা তাঁর ছাত্রাবাসের আবাসিক হিসেবে হৃদয়ে সেই আদর্শের সাথে নিজেকে যুক্ত করে স্বস্তি অনুভব করেছি।

প্রতিবছরের মত এবারও নেতাজীর জন্মোৎসব, ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট উৎসাহের সাথে পালন করেছি। এবারের অনাড়ম্বর পরিবেশে সরস্বতী পূজার সুরুচিপূর্ণ উৎসব আমাদের অনেক দিন মনে থাকবে।

পড়াশুনাতে তিন বৎসর ডিগ্রীকোর্সের ১ম অংশের পরীক্ষায় আমাদের অনেকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। অন্যান্য পরীক্ষার ফল আশানুরূপ।

খেলাধুলার কথা বলতে গেলেই প্রথমেই হোস্টেলের গেমস্ সেক্রেটারী শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষকে ধন্যবাদ জানাই। তার আন্তরিক চেষ্টায় আমাদের অপর হোস্টেলের সাথে ফুটবল খেলা প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে উৎসবের ভেতর দিয়ে দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলেছে।

আনন্দ ও কিছুটা গর্বের সাথে জানাচ্ছি মাননীয় অধীক্ষক মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় ও লাইব্রেরীয়ান অনুপম বিশ্বাসের সুষ্ঠু পরিচালনায় "টেক্সট্ বুক লাইব্রেরী" আমাদের কাছে আজ বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক মহাশয়ের দী
জীবন কামনা করি।

—শ্রীগৌরীপ্রসাদ সি
সাধারণ সম্পা

॥ রবীন্দ্রপাঠচক্র-সংবাদ ॥

অগ্রগতির পথ পরিক্রমায় রবীন্দ্রপ
এবারে তিরিশ বছর অতিক্রম করতে চ
গত ১৯৩৪ সালে শ্রীরামানন্দ চট্টোপা
পৌরোহিত্যে এর সৃষ্টি। উদ্দেশ্য : সাহিত্যে
শীলতায় প্রয়াসী ছাত্রবন্ধুদের বিভিন্ন উপায়ে
আলোচনা ও পাঠচক্রের নিজস্ব মুখ পত্র 'লিপি
রচনা প্রকাশের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।
এই কর্মধারার সরণিতে রবীন্দ্র পাঠচক্রের
পরিক্রমা.....

'লিপিকা'র চারটি সংখ্যা যথাক্রমে কাব্য
দ্বিজেন্দ্র-চন্দ্রিকা, গল্প-সল্প ও বাঙালী-
(চিত্র-সংখ্যা) এবারে প্রকাশিত হয়েছে।
বিচারে যদি কিছু প্রশংসা করার থাকে, ত
যুগ্ম সম্পাদক বন্ধুবর অসীমকুমার চট্টো
ও প্রলয় শূরের।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, আমরা কবি নাট
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম শত বার্ষিকী পালন
এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।
দিনের সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি
রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীতা
ভট্টাচার্য ও ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়।

এরপর ছাত্র বক্তাদের নিয়ে অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে "রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতা"র উপরে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়—গত ৫ই অক্টোবর অপরাহ্ণে।

এ বছরেই সর্বপ্রথম এক ব্যাপক সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আশুতোষ, যোগমায়াদেবী ও শ্যামাপ্রসাদ কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে পুরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র দ্বারা সম্মানিত হন, তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল :—

ছোট গল্প :—

প্রথম — সুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত : আশুতোষ কলেজ।
দ্বিতীয়— শিউলি গুপ্ত : যোগমায়াদেবী কলেজ।
তৃতীয়— জয়ন্তকুমার রায় : আশুতোষ কলেজ।
ও
সুপ্রকাশ সাহা : ঐ

প্রবন্ধ :— (বিষয় : বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য)
প্রথম—অমিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : আশুতোষ কলেজ।
দ্বিতীয়— স্বপনকুমার রায় : ঐ

কবিতা :—

প্রথম— জয়ন্তকুমার রায় : আশুতোষ কলেজ।
দ্বিতীয়— সুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত : ঐ
তৃতীয়— কালীকৃষ্ণ গুহ : ঐ

আবৃত্তি :—

প্রথম— সান্ত্বনা বসু : যোগমায়াদেবী কলেজ।
দ্বিতীয়— বাসবী মৈত্র : ঐ
তৃতীয়— অমলেন্দু ভট্টাচার্য : আশুতোষ কলেজ।

উপস্থিত বক্তৃতা : (সাহিত্য বিষয়ক)

প্রথম— জয়ন্তকুমার রায় : আশুতোষ কলেজ।
দ্বিতীয়— সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ
তৃতীয়— প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ

এই উপলক্ষ্যে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রখ্যাত কবি শ্রীনরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়।

সবার শেষে, ছাত্র বন্ধুদের বিশেষকরে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি যে, রবীন্দ্র পাঠচক্র অন্যান্য বিভাগীয় সংস্থাগুলির মত, শুধুমাত্র সাম্মানিক বাংলার ছাত্রদের জন্য নয়। আসলে এটা আশুতোষ কলেজের সাহিত্য-বিজ্ঞান নির্বিশেষে সাহিত্যানুরাগী প্রতিটি ছাত্রের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। বলাবাহুল্য এ কথা মনে রাখলে ছাত্রবন্ধুদের অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটবে।

সবার শেষে, শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাব সেই সব শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও ছা বন্ধুদের—যাঁদের নীরব ও সরব সাহায্য অপরিহার্য ছিল পাঠচক্রের বিভিন্ন কাজে।

বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এল। পিছনে ফেলে আসা পুরনো স্মৃতির জীর্ণ গ্রন্থি আর টেনে লাভ কী? এবারে নতুন দিন। নতুন আশা। নতুন পাতার গান। অনাগতদের প্রতি শুভেচ্ছা রইল।

—জয়ন্তকুমার রায়
সাধারণ সম্পাদক

॥ সম্পাদকীয় ॥

ঋতুচক্রের আবর্তনে বিশ্বপ্রকৃতির একটা পরিক্রমা শেষ হ'ল। নিত্য-সিঁড়ির ওঠা নামায় সুখ-দুঃখ ব্যথা বেদনায় ভরা একটা বছর কেটে গেল। স্বাভাবিক নিয়মে তাই, বন্ধন মুক্তির আলোক পেল—আশুতোষ কলেজ পত্রিকার অষ্টত্রিংশ সংখ্যা।

পত্রিকার রূপে আর রূপায়নে, ভাবে আর ভাবনায় একদিকে পূর্বসূরীদের সমবেত সুচিন্তায় দীর্ঘদিনের-গড়ে-তোলা ঐতিহ্যকে স্মরণ করে অন্য দিকে মোহমুক্ত চিত্তে নিত্য-নবায়মানতাকে বরণ ক'রে—প্রকাশিত হ'ল এক নতুন শিল্প-মানস। কারণ আমাদের মতে, মধুময় অতীতের প্রতি রতি আর মোহময় নতুনের প্রতি প্রীতি—এ দু'য়ের সমন্বয়েই প্রকৃত শিল্প-কৃতি।

পাঠকের বিচারে, এর ভাল-মন্দ দুটা দিকই অবশ্য আছে। যেটা প্রাপ্য হবে, তাকে গ্রহণ করবে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে, কৃতকর্মের মূল্যায়ণে।

০ ০ ০ ০

ছাত্র-বন্ধুদের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত যে লেখা এবারে পেয়েছি, তাতে পরিমাণে সম্পাদকের ঝুলি ভরলেও বলা বাহুল্য উৎকর্ষে মন ভরে নি। সেই কারণে, মনের আশাকে পত্রিকার পাতায় পুরোপুরি রূপ দিতে গিয়ে, অনিচ্ছাকৃত ভাবেই কিছু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে হয়েছে বর্তমানিক সম্পাদককে। অধ্যাপক ও প্রাক্তন ছাত্রদের রচনার আধিক্য তাই এবার অনেকেরই চোখে পড়বে।

পত্রিকার কথায়, অপ্রকাশের অন্ধকার থেকে, প্রকাশের আলোয় যাকে মুক্তি দেব—মুক্তির আগে সাধারণ নিয়মেই ভাব বিচারের পালা সারতে হ অনেককে নিয়ে যেখানে সম্পাদকের কারবার একই সঙ্গে সকলকে খুশী করার প্রশ্ন আসে কারণ, আগেই বলেছি, বিচারের মানদণ্ডে উৎক প্রশ্ন, অর্থাৎ মনোনয়ন—অপনোয়নের কথা। স্বাভাবিক নিয়মেই কেউ থাকবেন, কেউ বা পড়বেন। যাঁরা বাদ পড়বেন, তাঁরা অসন্তুষ্টির তুলবেন না এই ভেবে যে: শিল্প সৃষ্টি সা সাপেক্ষ।

রচনায়, কথায়, বিশ্বসাহিত্য-ইতিহাসের পা বাংলা ছোট গল্পের যে বাড় বাড়ন্ত অধ্যায়—ত আভাস পত্রিকার পাতায় প্রত্যাশা করলে নিরাশ হতেই হবে। যদিও অনেকেই গল্প লে চেষ্টা করেছেন, এবং আকারেও তা ছোট হ বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় শিল্প হয়ে উঠে অধিকাংশই যে তীক্ষ্ণ কৌণিক পর্যবেক্ষণে গল্পের বিষয় নির্বাচন এবং দৃঢ় ঋজু আ তার যাথার্থ্য শিল্পায়ন—এ দুয়েরই অভাব র গল্প গুলিতে। তবে, প্রকাশিত গল্পটির স্বতন্ত্র। আমার বিশ্বাস, লেখকের আন্তরিক সুর এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাঠ খুঁজে পাবেন গল্পটিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় একটা কথা এই না বলে পারছি না। সম্প্রতি ছোট রচনায় আঙ্গিকের অতি প্রাধান্য অত্যন্ত অস পাঠকেরা চোখে পড়ে। তাতে আদৌই বলার চেষ্টা নেই, কেবল কথার মারপ্যাঁচে

কৌশলে মনোরহস্যকে বিন্যাস করলেই যেন চলে। যুক্তি হিসেবে এই শ্রেণীর লেখকেরা বলেন যে: "জীবন যখন বিচ্ছিন্ন অর্থহীন, সুসংগতির ধার ধারে না, তখন গল্পও সেই রকমে চলবে আপনার খুশ খেয়ালে—পারম্পর্য ভেঙে।" কিন্তু জীবনের শৃঙ্খলায়িত রূপই প্রত্যাশিত সাহিত্যে। তাই, গল্প লিখতে বসে এ কথা সবার আগে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গল্পকে সোপানগত পারম্পর্যে সর্ব্ব-প্রথম গল্পই হতে হবে।

কবিতার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অর্থাৎ কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনের ভ্রান্তিই চোখে পড়বে। যাবৎ দুনিয়ার যাবৎ বিষয় অন্ততঃ আর নাই হ'ক, রসবাক্য হতে পারে না। বিষয় ভেদে কাহন ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। সেই কারণে না বললেও চলে যে: বিষয় নির্ব্বাচনের ভুলের ফসল সাম্প্রতিক কাব্য। তবে, কলেজ পত্রিকার লেখ-কেরা সাধনায় নিরত, এঁদের ভবিষ্যৎ ভাবীকালের গর্ভে নিহিত। এ কথা মনে রাখলে প্রকাশিত কবিতাগুলিতে পাঠক কিছু পাবেন বলে আশা করা যেতে পারে।

বক্তব্যের গভীরতা ও বিষয় বৈশদ্যের অভাব নেই প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে। তবে, প্রাবন্ধিক মিত্রবন্ধুদের অনুশীলন ক্ষেত্রের প্রাচুর্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

গত ১৯৬৩ সালে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে ভারত আত্মার মর্ত্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের শত-শতবার্ষিকী। শুধুমাত্র কতকগুলো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, প্রচলিত রীতির প্রতি প্রীতি বশতঃ আমরা যদি দায়িত্ব পালনে প্রয়াস পেয়ে থাকি তাহলে, এই শতবার্ষিকী ব্যর্থ আমাদের জীবনে। বলাবাহুল্য, স্মরণের সঙ্গে স্মরণীয়ের আদর্শকে প্রাত্যহিক জীবনে গ্রহণ করাতেই এর সাফল্য।

যাঁর পুণ্য নামের সঙ্গে এই বিদ্যায়তন জড়িত, সেই বাঙলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম-শত-বার্ষিকী সমাগত। বিশেষ করে এই শতবার্ষিকী উদযাপনের মাহেন্দ্র লগ্নে মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের সাত্বিক সাধনায় নিরত হওয়াই—আমাদের একান্ত কর্তব্য।

নতুন জীবনদর্শন প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে ঐক্য নির্ণয়ের চেষ্টা—যে মনীষীর সারাজীবন ব্যাপী সাধনা। বাংলা সাহিত্যের সেই একনিষ্ঠ সাধক আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম-শত-বার্ষিকী এ বছরে পূর্ণ হচ্ছে। এই সুযোগে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের অমূল্য গ্রন্থরাজির পুনঃ প্রকাশ ও বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। সাহিত্য পরিষদের এ ব্যাপারে অগ্রণী হওয়া উচিত।

আমরা যখন বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রীর বেতন উড়িয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড়াই করি ঠিক তখনই মাঝে মাঝে এমন দু'একটি ঘটনা ঘটে, যার নারকীয় বীভৎসতায় বিস্ময়ে নির্ব্বাক, স্পন্দন-হীন হয়ে পড়ি। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থানে ধর্মের নামে জঙ্গী আয়ুবশাহীর সুপরিকল্পিত হিন্দুনিধন যজ্ঞ —তারই অন্যতম!

স্বাধীনতার পর, দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সমস্যার স্থায়ী সমাধান আজও হল না। তার কারণ, এ সমস্যা নিছক রাজনৈতিক নয়। এর মূল আরও গভীরে। এ সম্পর্কে যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে :

এই সমস্যার (হিন্দু-মুসলমান) সমাধান এত দুঃসাধ্য, তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচল ভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানব-বিশ্বকে সাদাকালো ছক কেটে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করেছে—আত্ম ও পর।.....

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্ম সমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে, একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। মুসলমান কিন্তু কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ় ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর একদল আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার নিজীব। এদের মধ্যে সমকক্ষ ভাবে আপোস ক করে?.....

তাই ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই হিন্দু মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমক্ষমতা··· পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

* * *

গত ২৪শে ডিসেম্বর তিনদিন ব্যাপী ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের উনচ অধিবেশন এবারে অনুষ্ঠিত হল পাঞ্জাবের চ সভার সূচনায় উদবোধনী ভাষণ দিলেন, প রাজ্যপাল শ্রীধানু পিল্লাই।

মূল সভাপতির ভাষণে কবি দ্বিজেন্দ্র পুত্র সুর-সুধাকর শ্রীদিলীপকুমার রায় পাশ্চাত্যের ভোগবাদের পরিবর্তে ভারতের আদর্শ তথা ঈশ্বরের করুণাকে সাহিত্যে করার সময় আজ এসেছে।

সাহিত্য শাখার অধিবেশনে প্রবীন সা সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র সাম্প্রতিক সাহিত্যে ভয়মননশীলতার কঠোর সমালোচনা তাঁর অভিভাষণে।

সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি শ্রীকে বসুর মতে, গণতান্ত্রিক যুগে রসস্রষ্টাদের কা প্রিয়তার লোভ ছাড়িবার হয়ে ওঠায়, সর্ব্বসা পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে আমাদের সংস্কৃতির দিক আজ অবনতির পথে নেমে যাচ্ছে।

চারুকলা বিভাগের সভাপতি শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য
-নিরপেক্ষ গণনাটা রচনার আহ্বান জানান
কারদের।

পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীভাই যোধ
পাঞ্জাবী সাহিত্যের সামগ্রিক ক্রমোন্নতির কথা
খ করেন তাঁর ভাষণে।

এবার সাহিত্যে পুরস্কার পেলেন গ্রীস দেশের কবি
গিয়োস্ স্তিলিয়ানস্ সেফেরিয়াদিস্ (*Giorges*
lianos Seferiades) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে,
দেশ আর গ্রীক সাহিত্যের ভাগ্যে এই প্রথম
বল পুরস্কার। সেফারিসের এই বিরাট সম্মানের
নে রয়েছে, নোবেল কমিটির স্থায়ী সম্পাদক
Anders Oesterling এর মতে :.....
eminent lyrical writings inspired
a deep feeling for the Hellenic world
culture.

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য ঘোষিত আন্ত-
তক 'কলিঙ্গ' পুরস্কার এবারে পেলেন ইতিহাসের
বিশিষ্ট মার্কিন লেখক জিবার্ড পিয়েল।
ডাঃ অমিয় কুমার চক্রবর্ত্তী তাঁর "ঘরে ফেরার
কাব্য-গ্রন্থের জন্য এবারে (১৬৯৩) সাহিত্য
াদেমী পুরস্কারে ভূষিত হলেন।

বঙ্গ সাহিত্য সেবার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-
লয় কর্তৃক কবিশেখর কালিদাস রায়কে এবার
াজিনী বসু স্বর্ণ পদক দানে সম্মানিত
হয়।

শান্তি নিকেতনের পৌষ উৎসবে রবীন্দ্র-ভারতীর পক্ষ থেকে অনারারী ডি-লিট্ ডিগ্রী পেলেন আচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়।

পত্রিকার পক্ষ থেকে এঁদের সকলকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

* * *

বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এ বছর ভারত সরকার কর্তৃক পদ্ম বিভূষণ সম্মানে ভূষিত হলেন। এ ছাড়া, অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ, নয়াদিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীভোলা নাথ মল্লিক, বিজ্ঞানী ডাঃ জে. এন মুখার্জী ও ভারত-সরকারের খনিতত্ত্ব বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রী এ, বি, গুহ পদ্মভূষণ লাভ করেন। পদ্মশ্রী পেলেন যাদুকর পি, সি, সরকার এবং দিল্লীর ইনষ্টিট্যুট অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সের ভারপ্রাপ্ত অফিসার লেঃ কর্নেল সন্তোষকুমার মজুমদার।

এঁদের সকলের সম্মান লাভে আমরা গর্ব্বিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। যথা-ক্রমে তাঁদের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'ভারতের সাধক' এবং 'আকাশও পৃথিবী' নামক গ্রন্থের জন্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে, ঔপন্যাসিক শ্রীবিমল মিত্র আমাদের কলেজের একজন প্রাক্তন

ছাত্র। শ্রীমিত্রের এই সম্মান লাভে আমরা গর্ব্বিত।

শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বর্তমান বর্ষে ভুবনেশ্বরী পদক পেলেন প্রখ্যাত প্রবীন কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার পেলেন 'আমার ঘরের আশে পাশে' গ্রন্থ রচয়িতা অধ্যাপক ডঃ তারকমোহন দাস।

আনন্দবাজার, দেশ ও হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'প্রফুল্ল স্মৃতি' ও 'সুরেশ স্মৃতি' পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ও অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত 'শিশির কুমার' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীমনোজকুমার বসু যুগান্তর পত্রিকার 'মতিলাল' পুরস্কার পেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে, শ্রীবসু আমাদের কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র। বলাবাহুল্য, তাঁর এই সম্মান লাভে আমরা বিশেষ ভাবে আনন্দিত।

'মৌচাক' পুরস্কার পেলেন শিশু সাহিত্য রচয়িতা প্রখ্যাত কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব মহাশয়।

আমাদের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক শ্রী কুমার রায়, তাঁর রিসার্চের জন্য এবছরে জি, সি থেকে পাঁচশত টাকা বৃত্তি লাভ করে

গবেষণায় নিরত অধ্যাপক শ্রীরায়ের স কামনা করি।

গত বছরে (১৯৬৩) আমরা উদ্ করেছি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষী প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের জন্ম-শত-বার্ষিকী। বা নাট্য সাহিত্যে এই দুই মনীষীর অবদানের কারো অজানা নেই।

শতবার্ষিকী উৎসবের মধ্যদিয়ে, এঁদের সাহিত্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি

ইংরেজী সাহিত্যের অমর কবি ও নাট উইলিয়াম শেক্‌শপিয়ার *(William Shake are)* এর চতুর্থ জন্ম-শতবর্ষ (১৯৬৪) উৎসবের ঢেউ সাগর পার থেকে আমাদের দে এসে লেগেছে। সর্ব্ব দেশের, সর্ব্বকালের, ভাষার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্‌শপিয় নাটকাবলীর সঙ্গে সম্যক রূপ পরিচয় না থা তাঁর সম্পর্কে যে কোনো মন্তব্য অপরিহার্য ক উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদের মতই শোনাবে।

এই সুযোগে তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে সক পরিচিত হতে অনুরোধ করি। এবং শে পিয়ারের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নি করি।

মৃত্যু যে মানুষের অনিবার্য পরিণতি তা আমরা জানি। এবং মানি। তবুও মানব জীবনের এই নিদারুণ সত্যকে স্বীকার করে নিতে হয়, অন্তহীন হাহাকারের মধ্য দিয়ে।

সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীসত্যকিংকর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুও তেমনি আমাদের মেনে নিতে হয়েছে—মর্ম ভেদী আর্তনাদের মাধ্যমে। সদালাপী, বন্ধু বৎসল, ছাত্রদরদী নিরাভিমানী এই অধ্যাপকের কথা—অনেক দিন সকলের মনে থাকবে।

আমাদের কলেজের দীর্ঘ দিনের কেয়ার টেকার শ্রীরামকিষণ সিং এ বছরে পরলোক গমন করেছেন। শ্রীসিং জীবিতকালে কর্তব্যনিষ্ঠা ও অমায়িক ব্যবহারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন।

এঁদের প্রত্যেকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি আমরা। শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে জানাই আমাদের সমবেদনা।

প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা শিশু সাহিত্য ও অনুবাদ শাখার একজন অগ্রগণ্য হোতা, কল্লোল যুগীয় সাহিত্যস্রষ্টা শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; ভারতের প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী ও প্রখ্যাত শিল্পীও সাহিত্যিক শ্রীঅসিত কুমার হালদারকে—এবছরে আমরা হারিয়েছি।

বিশ্বশান্তি ও মৈত্রীর উদগাতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চত্রিংশ প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির আকস্মিক হত্যা—সমগ্র দুনিয়ার রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি। মূলতঃ তাঁর মৃত্যু মানব মহত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা।

কেনেডি পরিবার ও আমেরিকাবাসীদের জানাই যে, বিশ্ববাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি, দেহমুক্ত কেনেডি আত্মার বেদী মূলে পুণ্যাশিখায় দান করবে উজ্জ্বল দীপ্তি।

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এবারে আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রীনিমাই ঘোষ ও শ্রীসুনীলকুমার সান্যাল যথাক্রমে ভূতত্ত্ব ও পরি-সংখ্যান বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে এই দুই কৃতীছাত্রের উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

এ বছর আমাদের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সুব্রতেশ ঘোষ যথাক্রমে খড়্গপুর (ইন্‌ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট অব টেক্‌নলজি) এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই দুই অধ্যাপকের গৌরবময় ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করি।

* * *

এবারে আসি আবেগ ছেড়ে গতিতে। কথা ছেড়ে কর্মে। এই কর্ম, আমাদের দৈনন্দিন বিদ্যায়তনিক জীবনের কর্ম। বিদ্যায়তন—ছাত্র-জীবনের দেব-দেউল। এই দেব-দেউলের শুচি-স্নিগ্ধ পবিত্রতা রক্ষা রাক ছাত্রদেরই একটা আবশ্যিক ধর্ম। তাই, স্বভাবতঃই এর বিচ্যুতি মনকে পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

শ্রেণীকক্ষের প্রাচীরগাত্রে একদিকে যেমন দেখেছি ছাত্রবন্ধুদের বিকারগ্রস্থ মনের অশালীন মন্তব্য। করিডরে, বারান্দায় ধুমপান, আর গন্থাগারের বই থেকে নিজ প্রয়োজনের অংশ টুকু ছিড়ে নিয়ে, অবশিষ্টাংশে অপাঠ্য মন্তব্য লেখার প্রাবল্য। অন্যদিকে ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ করেছি, রবীন্দ্রপাঠচক্র ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সংস্থা গুলির প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্রোতার অভাবে সভাকক্ষের অধিকাংশ আসনগুলি যখন প্রায় শূন্য, ছাত্রবন্ধুরা তখন নির্বিবাদে আড্ডা দিয়েছেন বাইরে দাঁড়িয়ে। এ সম্পর্কে পরে তাঁদের কিছু বললে বিদ্রূপও করেছেন প্রকাশ্যে।

কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ নিয়ে দোষারোপ করে লাভ নেই। কারণ প্রতি বছরেই এঁরা দেওয়া-লের রঙ্ ফিরিয়ে দিয়েছেন সযত্নে। দিনের পর দিন গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী কঠোর থেকে কঠোর তর করতে কোথাও দেখিনি তাঁদের অনাগ্রহ। তবুও আশ্চর্যের কথা, ঘটে নি এর পরিসমাপ্তি!

ছাত্রবন্ধুদের কাছে আমার প্রশ্ন: এ সব করে লাভ কি? ক্ষণিকের আবেগে উত্তেজনার খোরাক হয়তো জোটে, কিন্তু নিজেকে গড়ে তোলা থেকে যায় না কি বিরাট ফাঁকি? মধ্যেও কি যেন না পাওয়ার একটা অতৃ

সত্যি কথা বলতে কি, খেলাধূলা, শিল্প-সাহিত্য ছাত্র জীবনের প্রায় সর্ব্বস্তরে সীমাহীন ভয়াবহ এক উচ্ছৃঙ্খলতা। মাঝে ভাবতে হচ্ছে করে, এ কিসের প্রতি অবক্ষয়ের না প্রগতির?

ভয় নেই, নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে ছ দের সামনে কোনো নীতি প্রস্তাব আনি না। শুধু বলতে চাইছি—এ নিয়ে যথার্থ সময় আজ উপস্থিত।

সবার শেষে, পত্রিকা প্রকাশের নেপ নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাব শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, উপাধ্যক্ষ শ্রীনীর ভট্টাচার্য মহাশয়কে। এঁদের নানা উপদে পরামর্শ আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে প্রকাশে।

পত্রিকার বিভিন্ন কাজে অধ্যাপক শ্রীত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপ অধ্যাপক শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কু-ব অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার দাস মহাশয়ের —সশ্রদ্ধ চিত্তে আমরা স্মরণ করি।

যাঁর উপদেশ ও আন্তরিকতা আ প্রযুক্ত করেছে পত্রিকার কাজে—তিনিই পত্রি অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন বসু মহাশয়। পত্রিকা

র যে সম্পর্ক, তাতে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রশ্ন সে না।

ছাত্রবন্ধু অসীম চট্টোপাধ্যায়, স্বপন রায়, াণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, ন ভৌমিক ও মনোজ মিত্রের সাহায্যের নানা র্শন ছড়িয়ে রয়েছে পত্রিকার বিভিন্ন স্থানে।

—এঁদের জানাই আমাদের প্রাণভরা ভালো- সা ও হৃদয়ভরা আলিঙ্গন।

পরিশেষে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্বহেতু বন্ধু-সমাজের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করি। পারিপার্শ্বি-কতার যে সুযোগ, সুবিধা ও সময় পেলে পত্রিকাকে মনোমত রূপ দেওয়া যেত, নানাকারনে তা পারিনি। তাই, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেল পত্রিকার বিভিন্ন স্থানে।

আশা করি, পাঠকেরা তা নিজগুণে ক্ষমা করবেন। নমস্কারান্তে—

জয়ন্ত কুমার রায়

Asutosh College Magazine

❀

PROFESSOR-IN-CHARGE

Shri Satyaranjan Basu

JOINT-EDITOR

Shri Jayantakumar Ray.

&

Shri Amitkumar Gangopadhyay

1963 VOL. XXXVIII

Bhugol Sansad — [illegible]

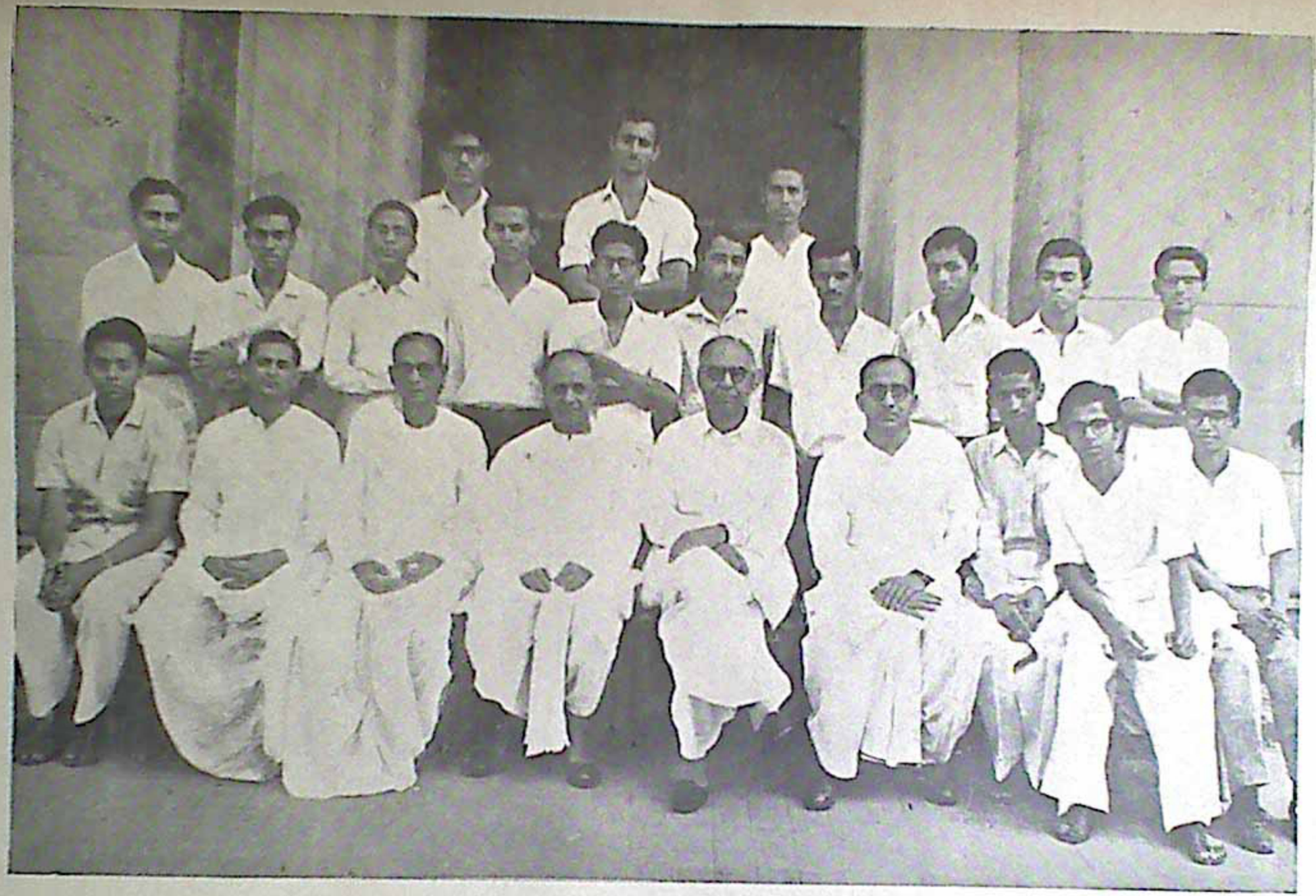

Sitting (L to R) R. Chowdhury, Prof. S. Bhattacharya, Prof. B. Dutta, Vice Principal N. K. Bhattacharya Principal K. N Sen, Prof. B. K. Banerjee, P. Banerjee (Wall paper Editor), B. Chatterjee (A. G. S of S. U), M. Maity (Secretary).

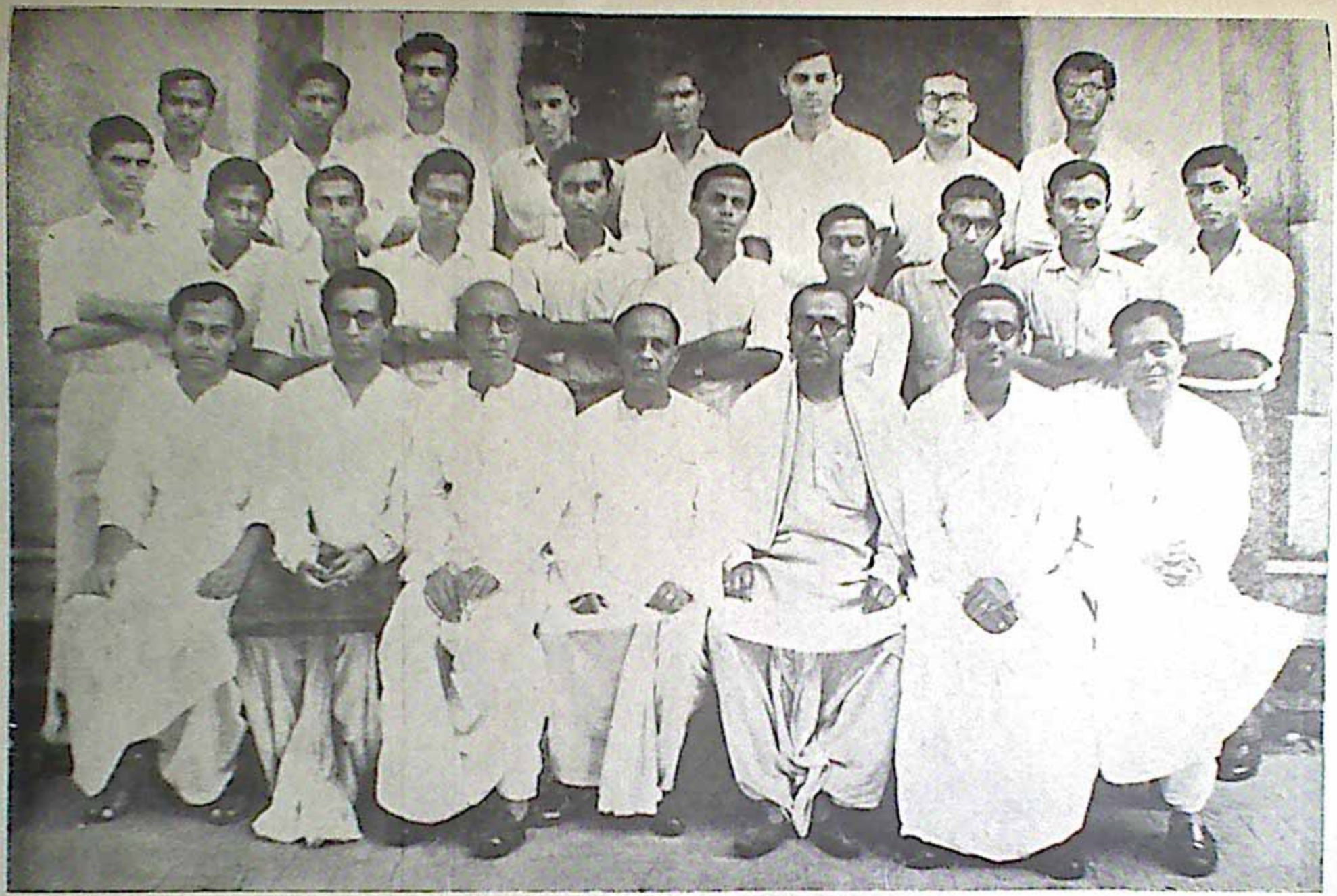

প্রথম সারি (বাম হইতে দক্ষিণ):— অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্য, অধ্যাপক সলিল গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য, উপাধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুকুমার বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক সত্যরঞ্জন বসু (সভাপতি ও পত্রিকাধ্যক্ষ)। দ্বিতীয় সারি:—জয়ন্তকুমার রায় (পাঠচক্রের ও পত্রিকার সাধারণ সম্পাদক), সত্যব্রত সান্যাল, সোমেন ঘোষ, অসীম ঠাকুর (সহকারী সম্পাদক), সুপ্রকাশ সাহা, স্বপন রায়, রঞ্জন ভৌমিক, পার্থ রাহা

TO SHAKESPEARE

(On his 400th Anniversary)

Prof : **Ajit Krishna Basu.**

Quiet flows the Avon still,
As it flowed on a St. George's Day
Four centuries back, when Elizabeth was Queen
Of England, and you first saw the light
Of day in Stratford on its bank,
Sweet Shakespeare, who immortalized immortality
By being immortal !

Elizabeth is England's queen again
As we, with the world, celebrate
The four-hundredth anniversary of your birth,
And you, born in England, belong to the world,
And never encircled by University walls,
Are more universal than all the universities put together.

"The rest is silence" were your Hamlet's dying words.
We wonder what *your* dying words were, beloved poet !
Your *silence* yearning Prince of Denmark, dying,
Left a larger legacy of *noise* in the wolrd of letters
Than any other character in all literature,
And the question is unsettled even now,

Three centuries and a half after you
shuffling off this mortal co
Whether your Hamlet's madness wa
real, or feigned, or both

O Dramatist who lived in an age whe
full-fledged male
Took the stage in full-fledged femal
role
With faces cleaned by the barber's art,
And the stage was bare—no painte
scenes in sight
Your audiences were greater imaginer
than *we* are
The magic eye of their imagination
Could see an orchard, a forum, a wha
not on an empty stage
Our eyes have to be spoon-fed, refusin
to imagine
Our artiste in a female role must be
she parading her *she* nes
Allaying all suspicion that she is
clean-shaven *he*
Our stage magic, backed by mechanic
and electricity
Leaves less and less to the eye of imag
nation

You wrote plays professionally for play
hungry peopl
Who had no newspapers, no novels, n
cinema to divert them

And so flocked to the theatre to forget
the ills of life
For a while, to gather sweetnes and
light.
You fed them well, and were well-fed
in return.
You fed them with laughter and tears,
joys and sorrows,
Human emotions of all kinds and
shades ;
You filled the stage for them with
villains, heroes and clowns,
Saints and sinners, lovers and haters,
sweethearts and shrews,
A seemingly endless galaxy of varying
characters—
And they thanked you, Will, with all
their hearts.

We thank you too, but can we thank
like them ?
We *worship* you with wonder as
immortal Shakespeare,
They *adored* you as their beloved Will,
Too deeply immersed in their p resent
love for you
To look into the future and see you
immortal.
O happy, happy first Elizabethans !

To us you are not a man, but a miracle,
Shakespeare !
The stuff you wrote seems too sublime
for human hands
And were we multi-millionaries, we
would gladly give our multi-millions
For just one look at your face,
One hearing of your voice,
And one shake of hands with you
Beside the quiet-flowing Avon,
William Shake speare !

———

The Pre-Raphaelites

Prof. **P. C. Sengupta,** Dept. of English

Origin :

In 1810 two German painters, Cornelius and Overbeck, founded a society in Rome, called the German Pre-Raphaelite Brethren. They gave themselves this name because they drew inspiration from the Italian painters before Raphael, 'in whom they found a sweetness, depth, and sincerity of devotional feeling, a self-forgetfulness and humble adherence to truth, which were absent from the sophisticated art of Raphael and his successors." In 1848 a Pre-Raphaelite Brotherhood was formed in England by three young painters Dante Gabriel Rossetti John Everett Millais and William Holman Hunt. They aimed at a return to older principles in painting, but as Rossetti and many of their champions and followers were gifted writers, their work gave rise to a literary movement along the same lines. In painting they advocated a close study of nature and a revival of the spirit and methods of the early Italian masters. They aimed at infusing the same spirit into literature, but as the movement progressed it developed a literary manner of its own which, though not strictly Pre-Raphaelite in character, is still given that name for want of anything more accurate. Among the notable poets who were influenced by the movement were William Morris and Swinburne.

Characteristics of the School :

(a) Medieval Outlook

Like the Romantics, the Pre-Raphaelites were inspired by the Middle Ages—by their romance, chivalry, superstition, and strange combination of the material and the mystical. Though earlier in date, Keats's Eve of St. Agnes may be said to be typical of Pre-Raphaelite poetry—picturesque, passionate exquisite in detail, and with all the exaltation and idealism of the troubadoursin its treatment of love. The same elements are prominent in the works of D. G. Rossetti and his contemporaries. "The return of this school was to medievalism different from the tentative and scrappy medievalism of Percy, from the genial but slightly superficial medievalism of Scott, and even from the more exact but narrow and distinctly conventional medievalism of Tennyson .... Moreover, though it may seem whimsical or extravagant to say so these poets added to the very charm of medieval literature, which they thu

vived, a subtle something which fferentiates it from medieval literature self. It is constantly complained that e graceful and labyrinthine stories, e sweet snatches of song, the quaint rama and legend of the Middle Ages ck life ; that they are shadowy unreal pestry on the wall, not alive even as ving pageants are. By the strong ouch of modernness which these poets nd the best of their followers introduced nto their work, they have given the ivification required."

(b) Art for Art's sake

"The Pre-Raphaelites were above all rtists. Art was their religion." They vere for the most part as free from any noral or didactic purpose as Keats who ame closest to them among the Roman- ics. In poetry, as in painting, they imed at perfect form and finish. A trong conception of scene and situation, precise delineation, lavish imagery, and vealth of detail, are their distinguishing haracteristics. Sexual passion is por- rayed more explicitly than was usual t that time, though in the most beauti- ul terms, as in Rossetti's sonnet-sequ- ence, The House of Life. The language and the images may have been rich and sensuous, but there was none of the coarseness found in many earlier wri- ters. Those critics who accused the Pre-Raphaelites of founding the Fleshly School of poetry were merely showing their own narrow-mindedness and appealing to the prejudices of a somewhat puritanical age. To such prejudices these artists and writers made no concession : they were intent on depicting or creating beauty for its own sake, without much regard for material reward or the approval of the moralists.

(c) Vivid Visual Presentation

As was natural in the work of writers who often were also painters, Pre-Raphaelite poetry was strongly pictorial, rendering in minute detail what was seen. They exercised this faculty for observation almost involuntarily. Rossetti, for instance, tells how he sat in the grass, bowed with sorrow.

My eyes, wide open, had the run
Of some ten weeds to fix upon ;
Among these few, out of the sun.
The Woodspurge flowered, three cups in one.

From perfect grief there need not be
Wisdom or even memory :
One thing then learnt remains to me —
The woodspurge has a cup of three.

His mind registered and retained this one small fact. There is a beautiful piece of word-painting in the first ten lines of the same author's Silent Noon :—

Your hands lie open in the long fresh
grass,
The finger-points look through like
rosy blooms :
Your eyes smile peace. The pasture
gleams and glooms
'Neath billowing clouds that scatter and
amass.
All round our nest, far as the eye can
pass,
Are golden kingcup-fields with silver
edge
Where the cow-parsley skirts the haw-
thorn hedge.
'tis visible silence, still as the hour
glass.
Deep in the sun-searched growths the
dragon-fly
Hangs like a blue thread loosened from
the sky

Pre-Raphaelite poetry is particularly rich in melody. They sought it deliberately, of course, and sometimes to the loss of any precise meaning. As Legouis says, "Vowels call to vowels, and consonants to consonants, and these links often seem stronger than the links of thougt or imagery. With some of the greater poets, however, for example Swinburne, the flow of musical language is so swift and profuse that it hardly appears to be the result of any conscious process; with him, indeed, it often submerges and obliterates the thought in a manner that could scarcely have been intentional. The alliterati and the onomatopoeic effects (the sou echoing the sense) seem to arise qu spontaneously, as in the opening li of a chorus in Atalanta in Calydon:—

When the hounds of Spring are on
Winters'trac
The mother of months in meadow an
pla
Fills the shadows and windy places
With lips of leaves and ripple of rain

The words echo perfectly the sou of the rustling leaves and the falli rain.

In the same poem we notice, t how the recurring 'tr' gives precise the right effect in

Ripe grasses trammel the travellingfoo
And how cunningly the differences
in speed are rendered in

The wild vine slips with the weight of
its leav
But the berried ivy catches and cleave
To the limbs that glitter, the feet th
sca
The wolf that follows, the fawn th
fli

Kinship with Romantic Literature :

It would be wrong to call the P Raphaelites as an entirely new scho of poets. They were anticipated

many ways in the early 19th century by Coleridge and Scott, and especially by Keats, and later by Tennyson, whose mastery of poetic technique set them a standard they endeavoured to follow. For this reason Saintsbury calls Pre-Raphaelitism a direct and legitimate development of the Romantic revival in England. Rossetti derived the impulse which led him to initiate the movement from Lord Houghton's Life and Letters of Keats, in which he first read of Keats' interest in Italian Pre-Raphaelite painting. What he and his followers actually did was to stress an element already present in the literature of a slightly earlier period. Their own influence lasted for a long time. It was conspicuous in the work of the aesthetic movement led by Oscar Wilde, and only named when English literature entered upon a phase of greater realism end materialism with the end of the Victorian Age and the beginning of a turbulent new century.

Teaching as a Profession

Sushanta Kumar Roy,
(An Ex-Student)

The importance of the useful work a teacher does in the society is fully set forth in the following oft-quoted sentence "A good teacher like Moses, strikes water out of the rock". In other words the above sentence means that a good teacher exercises a profound influence on the formation of the career and character of a student. The jesuists used to boast, writes Aldous Huxley, that, if they were given the child at a sufficiently early age they could answer for the man. A good teacher can, therefore, make or mar the life of a student. The evil that a bad teacher does lasts for life and can not be retrieved by any subseqaeet effort. An engineer can remedy his initial mistake at a subsequent stage and in almost any other job, except medicine, a mistake can be rectified without permanent evil effects. It is not so with the case of a teacher. And this makes a teacher's job a feareful responsibility to carry.

In view of the importance and the useful work that a teacher does for the society the next question that arises is how to attract the best type of people for the teaching profession. It is an admitted fact that a teacher, unlike the members of other learned professions namely the legal, the medical and th engineering, does not enjoy the sam social status or recognition. Mar look upon the teaching profession as "Safe job" that does not require an specialised skill and that any perso with a university degree is fit to be teacher. Herein lies the lacuna o the whole problem. The teacher's lif is a dedicated one and one should tak to the teaching profession by choic and not by compulsion. To make th profession attractive the increase i the pay scale in teachers is not enough There should be some psychologica test for selection of the right type o teachers. "Teaching", writes the emi nent English thinker Joad, "is no everybody's cup of tea, some are born to it and most can be trained to a respectable degree of compentence in it but there are others who can not by any amount of training, however, inten sive, be turned into even moderately good teachers."

This being so what are then the essential qualities that we should expect in a teacher for the proper dis charge of his work.

The qualities that make a good teacher are more varied than those

which can be inculcated at a University, and, in dealing with younger children specially, the prossession of specialised intellectual eqiupment is less important than the quality of sympathetically applied intelligence. It is also true a teacher must have inspiration, sympathy with the young and a consuming interest. Thus, unless a teacher loves his work and takes pride in his work, he can not be a successfull teacher. He must have respect for himself and his work and in that case he can inspire respect in others. No man can be a good teacher unless he has feelings of warm affection towards his pupils and a genuine desire to impart to them what he himself believes to be of value. Teaching is a peculiar job in the sense that it invloves the constant association of maturity with childhood, and the older the teachers get, the less likely they are, except for a few saints, to retain the sympathy and understanding for young children without which teaching becomes a thing of vain repetition.

A further point that is not always realised is the demands made on a teacher by the nature of his job. The outsider views his six-day week, eleven-till four day and twelve weeks' holiday a year with every and occasional malice. No other occupation is technically "On the job" for such a short period—two hundred days out of the three hundred and sixty five. Yet the good teacher's job does not finish when the last bell rings in the afternoon, there is further work to be prepared, children's work to be marked, and many out-of-school activities to be supervised. The good teacher has, moreover, to go on educating himself if he is to remain fresh and effective at his task, for a stale and tired teacher makes stale and tired children. Children respond to enthuasism and are repelled by boredom. The good teacher tries to establish a personal link between himself and his audience, but it is of necessity a group relationship between a teacher and his pupils. The good teacher has to mean something to each of his forty pupils that is essentially individual, and which continues day after day and year after year. This an exhansting business.

It is unfortunate that neither our Government nor our society has done anything effective so far to realise the real significance of a teacher's job and to accord to him the status and remuneration commensurate with his work. The resultant effect is the dearth of suitable teacher in our colleges and schools. Those who take to teaching do so as a stop-gap arrangement and leave the job as soon as they find a suitable opening elsewhere.

The recent announcement of the Government of India to grant loan cum scholarship to students with a view to attracting right type of men to the teaching profession is a more in the right direction Let us hope that our youngmen will respond enthusiastically to the scheme and there will be no lac of good type of teacher Without goo teacher the entire educational structur is bound to callapse with disastrou results—the effects of which we can no yet foresee.

A Reminiscence of College-days

Arunodoy Bhattacharyya
Third Year, B. A.

Four summers came and went, four winters did the same. Springs and autumns were, as usual, never really felt ; and monsoon reigned long like a slow but confident batsman over this gay and bright yet dull and mucky city of Calcutta. Four times came the New Year's Day and the thirty-first December ; four years rolled out and lost themselves into the eternal flow of time. And it is time for me to bid adieu to my college, for my career as a student here has come to its end

So recollect my days at college in the imperfect casket of my memory, I must confess, I am not filled with any ecstatic delight, nor am I thrown into a fit of melancholy at the thought of what I left behind. But in retrospection those days appear to be wearing a charm about them ; colourless even though they would seen to anybody, and intolerably boring to many.

I was only a little boy to seven when I first visited the college with my father I gaped in wonder and admiration at the sight of the huge, white, stony building with so many collapsible gates, some closed, some half-closed and same wide open. What I particularly relished was the ringing of all the electric bells at one and the same time. I just could not imagine how it was possible ! But the child in me was disappointed to find that the college-teachers were very much like the school-teachers in appearnce and were not at all some angelic figures as my fancy conceived them. How very foolish I had been !

Of my student life in the college what should I say and what I should not say, I hardly know. It was strictly academic. True, I stood at the head of the students of my college who were successful in the University examination, and was awarded a hearty reception by the Union-boys ; but the many-sided expression of youthful exuberance was an object of mere dream for me. I never took part in the college-sports ; I never represented my college in a *debate* or in any competition. Nor was it recorded of me that I ever violated any college-rule or quarrelled with any clerk or passed any objectionable remark on the face of any teacher.

Off-periods bored me for I had not a large number of companions with whom almost every college student is blessed or unblessed. I had no appetite for

restaurant-dishes and never, even to keep a friendly request, had I taken an unnecessary cup of tea.

I avoided the Common Room as far as I could for boys there made free exercise of their tongue, and the atmosphere was rather too warm for me. Sometimes I would sit in the college library trying to feel the presence of "the mighty minds of old" as Southey phrased it, and looking at those heaps of books which, by their very appearance, betrayed the fact that they had not been used for many years. I never became a member of the college-library because experience of other boys taught me that there was little possibility of getting any practical help from it; for though it had a sufficient stock of useful books, one could never get them on demand. In this respect, at least, Asutosh College can claim a novelty!

What I loved most besides the teaching of good professors, who are always regrettably few in number, was the college building itself. What I most enjoyed was not playing a game at table tennis or carom, or reading a film magazine in the Common Room or clinching my fist and shouting myself hoarse at the times of the election of class-representatives. Even the annual Bichitranusthan where the essential duty of every student was to shout "No more!" to the adventurous student artists, and shout "Another, we say!" to a professional popular artist wh had already sung half a dozen—was n a very great attraction for me; an lately I avoided it for the fear of bein suffocated! Rather I delighted in tak ing possession of an empty room, an wite an instinctive curiosity, peruse th snatches of rare poetry on its wall There I could find blank verses an heroic couplets and sonnets dedicated t various heroines. Or I would take a commanding view of the adjoinin park from a southern windows: th sun shining on its green, and so shadows of trees weaving some com plicated pattern on its carpet of grass I would be immersed in a quiet pleasan meditation, and roused from it by th noisy entrance of boys when the bel had indicated the end of a period.

Sometimes when the college broke up early, I liked to loiter about the lonely corridors and listen to the 'tik tik-tik-tik' produced by the revolving fans in quiet room. Some boisterous sparrows would come to play and would constantly dance and chirp. And then the entire building lost its officia air; and became, for me a deserted palace and intensely mysterious; as i anything might happen then: a princess might appear, a ghost might stare. And I thought, like a dreamer of sweet dreams, what if this silence and this desolation continued for ever?

H. G. Wells

Debabrata Sarkar, B A. 1st year

Those who are content with seeing in Wells merely a refinement and elevation of the common Englishman will fail to arrive at a correct assessment of his greatness and excellence. A true and balanced estimate of the important position this man of prodigious intellect holds in English Literature requires us to treat him as a man whose intellectual interests and activities, springing from a narrow and circumscribed scope of living gradually and steadily attained to a larger and larger outlook. Of him it may be said more truly than of any other Englishman that his life's struggle represents that of an adventurer trying to free himself 'from the family association in which he was engendered so that he might become a cosmopolitan citizen

Yet in all the writings of Wells who was undoubtedly a prolific writer we seldom miss the stamp and impress of his distinctive English individuality. It should be remembered, in this connection, that the rich and manifold experiences he had gathered both at home and in the course of his travels abroad went into the making of the great personality which leaves its peculiarly English flavour almost in every page of his numerous works

At any rate it is a striking and remarkable fact about Wells's more representative work that he was writing in a subjective way. In other words, he was writing about the world as he perceived it through the medium of his senses. But this sense perception was not sufficient in itself. It had to be transfigured by his own unconscious reactions to reality. He was depicting facts from the outside world. But he was not satisfied with describing them as they actually were. He was casting them in the mould of his perfervid imagination. He was colouring them with the hue of his characteristic genius and personality.

Wells had a chequered career and a wide variety of knowledge and experience. He came into contact with people belonging to different vocations and stations in life He mixed with lawyers, statesmen, men of business, craftsmen, artisans, men of letters and what not. Some of these appear in his books as merciless caricatures. Thus equipped with a store house of valuable information Wells began to write and he wrote so many brillient books afterwords, which elicited the love and admiration of the reading public in England and elsewhere.

Wells had a taste for geology and biology and acquired a leaning towards science quite early. It is interesting to note what application he makes of his scientific knowledge to real life, especially in such books as 'The Time Machine', 'The war of the worlds and 'The Invisible Man'.

Shaw and Well's were two contemporary writers whose minds were deeply stirred by the social moral and intellectual problems of the age In these books they deal with these problems. There is, however, a gulf of difference between the procedure of H. G. Wells and that of Bernard Shaw. Wells follows the deductive process to arrive at a generalisation. Shaw follows a different method. Starting with intellectual generalisations he falls upon the ingenious device of illustrating those general ideas by creating characters. Shaw expounds the moral, intellectual and social problems of his time. Wells has a different part to play. England, in his time, was changing very quickly. It is a picture of the fast changing England that Wells gives us. He is the most redoubtable exponent of its aims and ideals, its ambtiaons and aspirations'

Wells draws the picture of a better world, struggling to be born under the impact of the inviolable laws of evolution. Man is conceived as an untell gent being who can use his will an intelligence in the reshaping and rebui ding of this world. This is the ide occurring in 'The Time Machine'. I his novels 'Anticipations' and 'Mankin in the Making' Wells holds before us sad and distressing picture of the Engls society of his time. He describes here with sufficient gusto, how English me are dissipating their energy and vigou uuprofitale rivalrics and in unhealth competrttin struggles.

Wells assumes a new role in 'A Modern Utopia.' In this book h exhibits the zeal and enthusiasm of reformer. He is keen on refoming an reorgansing contemporary English socie where things were going dead wrong He not only denounces the evil circums ances but also suggests the ways an means of getting rid of those circums tances. He feels and feels very earnestl that wrong must be righted and tha society must be cured of its ills an placed on a better footing. Accordin to Wells human nature being eternall restless cannot be satisfied with any thing static.

The promised land envisaged b Wells is something different from th 'Utopia' of Sir Thomas More or th republic of Plato. In 'A Modern Utopi Wells gives us a picture of what h

ideal state should be. It should be a dynamic state quite in harmony with the ever changing human nature. It is the picture of a world which is free from the vices of the present system. We have here a clear understanding of the socialistic views of Wells. A distinguishing feature of this socialism is that it is not incompatible with individual liberty. Indeed, it will be no exaggeration to say that the dreams and ideals of Wells as enshrined in this book are already on the way to realisation.

THE REPORT OF THE GEOLOGICAL ASSOCIATION (1963–64)

Due to some difficulties our election of the Executive committee for 1963 64 in our annual meeting remained incomplete.

Our President advised the last year's Asst. secy. Arup Kumar Mukhopadhyay to perform the function of the secretary, till the election is complete.

Within this short range of time, the following matters were transacted.

Wall magazines were published regularly twice a month which have earned some appreciations from the students.

A proposal has been made to hold an exhibition and we hope to hold the same during the month of April and we shall try our best to make it successful.

The result of the essay competition held in the last year was announced at the Annual Meeting, Ashoke Mukherjee of 3rd yr. B Sc. Class secured the first place and he received a silver medal. This year also we hope to arrange similar competition to encourage the study of geological sciences.

A popular lecture held in October '63 about the 'Interior of the Earth' and was delivered by Arup Mukhopadhyay of 3rd yr. B. Sc (Hons) class.

We like to publish a geological magazine in the near future and expect to receive interesting articles from the students as well as teachers.

Arup Mukhopadhyay.
(Officiating Secy.)

ANNUAL REPORT OF BHUGOL SANSAD

It is a great pride for me to forward the annual report of **Bhugol Sansad**, which was formed with the following objects :

(a) To promote & disseminate geographical knowledge through discussions, lecturers, publications, wall papers, exhibitions & Museum

(2) To inculate a spirit of independent enquiry through scientific excursions & expeditions.

In enumerating the different activities of the Bhugol Sansad in last year, firstly, I should mention of the **"Earth Science"** exhibition, organized jointly by the Geography & Geology Departments of Asutosh College & Jogamaya Devi College, held on March, 1963. On that occasion Dr. R. K. Lahiri of Geography Department, Calcutta University delivered lecture on "Clouds & Weather forecast"

Annual Geographical Excursion was held at Giridi area in October, 1963. They studied intensively the physical, economic & social aspects of the area with keen interest. They also visited the Serampur Vertical shaft coal mine of N C.D.C., Pareshnath Hills & Usri Falls etc.

Bhugol Sansad also arranged some film shows on Geographical topics in collaboration with U. S. I. S. & British Information Service.

I am greatly dissappointed in th matter of wall paper. Due to lack energy & enthusiasm of students, on an illustrated excurtion report had bee published.

Before conclusion, I like to reque the highest authorities of our Colleg to procure two most useful things, i. a 16 mm. Projector & a moder Epidiascope, for the use of seminers different departments & general pu poses of our College. We used to fac a trickle problem in screening the slide which visiting professors bring wit them, in the very old & partly unwor able Epidiascope lying in the Physi Dept. of our College. And if we hav a Projector we may arrange film show of highly technical type of differen subjects —helpful to our study, by borr wing such films from different fil libraries.

In the end I convey our thanks our Principal K. N. Sen and Vic Principal N. K. Bhattacharya for the valuable suggestions & inspiration Last but not the least we express ou sencere gratitude & adoration to Pro B. Banerjee, Prof. S Bhattacharya, Prof. B. Datta, who help us in ever respects whenever approached by an one of us.

Mihir Maity
General Secretary
Bhugol Sansad

Annual Report of the Biological Association (1963--64)

It was in 1957 that the Association was formed. But it could not function continuously since then. After lying dormant for a few years, it became active again in 1963.

The Executive Committee formed for the year '63—'64 under the Presidentship of the Principal Prof. K. N. Sen consisted of the following : Vice-President—Prof. P. Chatterjee and Prof. N. Sengupta, Treasurer—Prof. N. Pathak, Genl. Secretary—Arun De, Asst. Secretaries—Bimal Das and Amar Mukherjee, Editor—Kajal Bal and Sub Editor—Bimal Das.

The Association was inaugurated by our President and we arranged a film-show on that day in the college hall.

Within this short time our main achievement which I can mention here is the publication of a wall magazine regularly per month. Behind this success there was the magnificent work of our Editor Kajal Bal and the artistic work of Srikanta Roychowdhuri, an active member.

On December 20th, we went out for a local excursion with Prof. N. Mallick and Prof. N. Pathak as our guides.

An essay compition is going to be held in the near future for the members of the Association and prizes will be awarded for this We also expect to organize a large scale Exhibition on the occasion of the Birth centenary of Sir Asutosh Mukherjee.

In this year we got hundred rupees as a help from the student's union and I would thank the Principal as well as president and Genl. Secretary of the Student's Union for this help.

It is a matter of regrate to me that within this short time, since September last, it was not possible for me to progress further. I hope the future Secretary will be able to show great progress with the co-operation of students of the coming session

Lastly I would express my heartfelt thanks to the President, Vice-Presidents and other Professors for their valuable advice and to the members for their kind co-operation which led me to perform various functions successfully.

Arun Kumar De.
General Secretary
Biological Association

"CULTURAL REPORT"

We still admit the Biblical Truth 'Man cannot live by bread alone'. He needs something more which transcends the basic needs of life and yet inevitable for living a human life. As Education is the manifestation and perfection of character. Culture is the charming fulfilmens of life. And our College had never failed in advancing the cause of Culture. I was entrusted with the charge of Cultural Secretary in February 1963 and was afraid whether I would be able to discharge my duties properly.

'Freshers' Welcome Ceremony' is a traditional function of our College which introduces the new to the old and helps to develop a sense of fraternal relation among students. The talent of the students finds a chance for expression and thus receive encouragements. I too, organised this with the help of my associates and general students. Enthusiastically the students participated in different items like Music, Drama and Recitation.

Under the guidance of Prof. Sunil Siddhanta we staged 'Chikitsa Sankat' by Parasuram. It was tremendous success. The songs of Sri Chinmoy Chatterjee, an ex-student of our College, gave additional colour to the occasion. V. Valsara amused us with some of his masterly strokes. I can make a frank confession that I indulged my pride in presenting Jogesh Dutta, the greatest mimic of our country.

The 'Annual Social' was also a great success. We staged Baikunther Khata' of Kbriguru in which some of our ex-students kindly played some roles. We are grateful to Prof. Siddhanta, for his able directions and to Sri Subir Sen an ex-student of our College, who delighted the audience with his songs.

Our College Music Competition was held at Tansen Music College. Rabindra Sangit and Adhunik were the two items on which the competition was held Sri Sailendra Nath Banerjee became the Judge of the Competition. In Rabindra Sangit Asit Banerjee had the rare distinction of becoming First Prize winner while Suranath Mukherjee and Arup Biswas stood Second and Third respectively. In Adunik S Asit Banerjee stood First and Sakt proasad Das Thakur and Arup Biswa became Second and Third. The Prizes were distributed by our Principal Shri K. N. Sen.

The 'South Calcutta School an College Vivekananda Centenary' celebrations were held at Rabindra Sarob Indoor Stadium ; two of our studen

Sri Anup Ghosal and Sri Amalendu Bhattacharya showed their excellence in Music and Recitation respectively. Both of them stood First.

Our Students' Union President, Professor Biswanath Chakrabarty Prof Sunil Siddhanta and my colleagues Sri Prabir Sengupta, and other Union members helped me in my manifold activities. I am grateful to all of them

I shall very soon leave the College and one day my name will pass into oblivion, but I shall cherish the name of my College in my heart of hearts. I hope that my friends will try to uphold the prestige of my College and will love and honour the institution as deeply as I did.

Asit Banerjee
Cultural Secretary.

Asutosh College Ambulance Division

Asutosh College Ambulance Division was formed in 1933 and is now the second oldest division in West Bengal. The Division has been continuing its First Aid and other relief works since its inception. The usual duties include First Aid at play grounds, sports functions, melas, social gatherings and various other relief works as also transport of patients from their residence to the hospital etc and vice versa. The service of the division is not only confined to Calcutta but is extended throughout India when necessity demands

The division also maintains on the College premises, a permanent First Aid-post, a vaccination and inoculation centre.

Principal Sri K. N. Sen and Vice Principal Sri N. K. Bhattacharya are the President and Vice-President respectively Dr. P. K Ghosh is the Divisional surgeon and Sri A. R Dutta is the superintendent, Sri P. K. Roy, Sri A. Banerjee are the two Ambulance Officers

The division is open to all bonafide students of Asutosh College who have passed the First Aid examination of the st. John Ambulance Association [India]. First-Aid classes are held once or twice a year for the students of Asutosh College who want to be the members of the Division. First-Aid theoretical and practical classes, squad and stretcher drills are held every sunday for the members of the Division.

An important feature of the Ambulance division is that the membership is not cancelled when a students leaves

the College but continues until he loses his efficiency.

This year a total of about 319 cases were attended while on public duties and about 230 cases were attended while not on public duty, 283 persons including the students and the members of the staff of Asutosh College & Jogamaya Devi College were vaccinated against small pox. The Annual Inspection was held on 11.8.63 at Syamaprasad Gymnasium. 32 members were present. Mr. J. N Ghosh. Dist. Officer and Mr. S. Bose Dist. Officer very kindly inspected the division. The Annual Training camp for the year 1963 was held at Purulia from 25 th. December to 31 st. December, 1963. A large numbers of members of the Division also participated in th ceremonial parade on the occassion the Indian 'Republic Day'

The Government of India has fe the need of first Aid Training in Mil tary as well as in civil life. Und their instruction, Civil Defence casualt Service has been organised by the Dir ctor of Health Service, West Beng Sri Durgadas Saha, the Sergeant our division has been selected to unde go the instructorship training in th said casualty service.

In this connection, I avail the oppo tunity of extending a cordial invitatio on behalf of our Division to all th students of Asutosh College to ava the opportunity of getting themselv trained in first Aid.

Durgadas Saha
Sergeant.

Improtant Addition To The College Library

(GENERAL AND TEXT BOOKS)

English

1. B. Dobree English literature in the early eighteenth century
2. Douglas Bush English literature in the earlier seventeenth century
3. J. M. Nosworthy—Cymbeline
4. E. A. J. Hanigmann—King John
5. J. B. Broadbent—Some graver subject an essay on Pradise Lost
6. Edwin Muir--Estate of Poetry
7. S. H. Steinbery—Cassell's Encyelopoedia of literature Vol I & II
8. C. S. Lewis—English literature in the sixteenth century

Bengali

১। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—কাদম্বরী
২। শান্তিকুমার দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য
৩। বিমলকৃষ্ণ সরকার—ইংরাজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ণ
৪। ক্ষেত্র গুপ্ত—মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প
৫। কানাই সামন্ত—রবীন্দ্র-প্রতিভা
৬। অমূল্যনাথ চক্রবর্ত্তী—ভারতে-শক্তি-সাধনা (প্রথম খণ্ড)
৭। শিবশংকর শাস্ত্রী ও বিনয় সরকার—প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যর রূপরেখা
৮। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র
৯। হিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী—বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা
১০। ক্ষেত্রগুপ্ত—কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী
১১। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালীর সাহিত্য (আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগ)
১২। তারাপদ ভট্টাচার্য—বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন পর্ব)

Statistics

1. B. N. Asthana &
   S. S. Srivastava—Applied statistics of India
2. J. N. Kapur &
   H. C. Saxena—Mathematical Statistics

3. J. P. Guilford—Fundamental statistics in Psychology and. Education
4. H. A. Freeman—Industrial Statistics
5. Frank Yates—Sampling methods for gensuses and surveys
6. E. M. Schrock—Quality control and statistical Methods

Geology

1. Pradip Kumar Mukherjee—Text book of Geology
2. H. H. Read & J. Watson—Introduction to Geology Vol. I
3. Eugene N. Cameron—Ore Microscopy
4. L. Cagniard—Reflection and refraction of Progressive seismic waves
5. Robert. S. Lewis—Elements of mining
6. V. V. Beloussov—Basic Problems in Geotectonics
7. Hans. Ramberg—Origin of Metamorphic and metasomatic Rocks

Botany Biology and Zoology

1. Mukherjee & Ganguly—Plant groups
2. Paul B. Weisz & Melvin S. Fuller—Science botany
3. Constantive John Alexopoulos—Introductory Mycology
4. Robert S. Meewen—Vertebrate embryology

History

1. প্রেমবল্লভ সেন ও প্রণব বল্লভ সেন — ভারত ইতিহাসের বিবর্তন (প্রাচীন যুগ)
2. E. H. Carr—International relations between the two world
3. A. Zimmern—Greek Common Wealth
4. George Kirk—Middle east, 1945—1950
5. H. A. L. Fisher—Bonapartism
6. George Clark—Later stuarts 1660—1714
7. G. R. Elton—England under the Tudors
8. G. M. Trevelyan—England under the stuarts
9. G. Lefeb vre—French revolution
10. R. C. Majumder—British Paramouncy and Indian Renaissance

Politics and Economics

1. W. B. Reddaway—Development of the Indian Economy
2. A. K. Basu—Fundamentals of banking theory and practice
3. M. P. Sharma—Public administration in theory and practice
4. L. Oppenheim—International Law Vol I
5. D. N. Banerjee - Our foundamental rights
6. Mohesh Prosad Tandon –International Law
7. V. D. Mahajan—International Politics Since, 1900
8. W. W. Lockwood—Economic development of Japan
9 H. Schwartz - Russia's soviet economy
10. বিভুরঞ্জন গুহ—সমাজ দর্শন
11. Basak & Gupta—Study of the theory of Public finance
12. K. C. De – Representative Government
13. K. C. De—Aristotles Politics

Geography

1. S. N. Mukherjee Agr. Geography of west Bengal
2. M. R. Choudhuri—Indian Industries
3. D W. Brogan – France
4. Charles W Thayer—Russia
5. E. C. Dapples—Basic Geology for science and engineering

Sanskrit

1. Lakshman Sarup – The nigh antu and the nirukta
2. A. Chinnaaswami Sastri—Yajna Tattva Prakasa

Logic and Philosophy

1. Radhakamal Mukherjee—Philosophy of Personatity
2. Ronald Jager—Essays in logic
3. M. R. Cohen & Ernest Nagel—Introduction to Logic
4. H. Wolf – Text book of Logic
5. W. F. Hocking—Types of Philosophy
6. J. E. Creighton – Introductory Logic
7. C. Bhattacherjee—Elements of Indian Logic & epistemology
8. S. K. Maitra - Fundamantal of Indian Logic

Physics

1. J. Barton Hoag—Electron and nuclear Physics
2. David Aalliday – Introductory nuclear Physics
3. A. S. Eddington – Mathematical theory of relativity
4 A. S. Kompaneyets—Theoretical Physics
5. C. S. Siskind – Electricity
6. H. Cotton—Applied electricity
7. James Jeams—Mathematical theory of electricity and Magnetism
8. B. K. Mathur – Principles of optics
9. A. N. Puri—Advanced Examples in Physics

Chemistry

1. E G. Rietz & C. B. Pollard Prablems in organic chemistry
2 L. A. Hiller & R. H. Perler – Principles of chemistry
3. W. F. Sheehan – Physical chemistry
4. Bhattacharjee & Mukherjee – Essentials of Inorganic chemistry
5 Walter Hiickel – Theoretical principles of organic chemistry Voc- I & II

General Topics

1. States man's year book 1963
2. Current Affairs 1963

List of Editors

1924—1963

Prof. Mohini Mohon Mukherjee (1924); Basudev Banerjee (1925); Bibhas Roy Choudhury and S. Raghvavachari (1926); Subodh Biswas, Dhiren Lahiri and Satiranjan Banerjee (1927); Sasi Bhusan Barik and Kalyan Kumar Sengupta (1928); Asoke Kumsr Banerjee and Shyamapada Mukherjee (1929); Prabhat Kumar Bose and Kausik Kumar Mitra (1930); Shyamapada Mukherjee and Prafulla Kumar Sarkar (1931); Amiya Ratan Mukherjee, Bireswar Chatterjee and Batto Krishto Banerjee (1932); Hari Prasanna Chakravarty and Prabhat Sen (1933); Govinda Roy and Anil Kumar Chakravarty (1934); Binoy Ghosh and Basanta Ghosal (1935); Devaprasad Bhattacharya, Santosh Mitra and Miss Bani Roy (1936); Devaprasad Chatterjee, Narahari Kaviraj and Miss Bani Roy (1937); Santosh Bose and Miss Pratima Banerjee (1938); Subrata Sarkar and Miss Nirupama Banerjee (1939); Ramkrishna Maitra and Miss Alaka Guha (1940); Santa Ghosal and Sm. Lila Maitra (1941); Subhendu Banerjee and Sm Kshama Banerjee (1942); Samir Basu and Sm. Purabi Banerjee (1943); No publication owing to 'Paper Economy' (1944); Asim Bhattacharya, Amiya Mukherjee, Jibendra Sinha Roy, Ramendranath Bose, Sm Kamala Dutt and Sm Indira Bose (1945); Editor-in-chief; Pijuskanti Chatterjee, Arunkumar Dasgupta, Naresh Chandra Ghosh, Suhas kumar Roy, Ramprasad Chakravarty, Amal Kumar Chakravarty, Sm. Samjukta Kar and Sm. Srimati Chakravarty (1946); Editor-in-chief: Sobhanlal Mukherjee, Arun Mukherjee, Asoke Sengupta, Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly, Sukumar Banerjee and Sm. Pushpanjali Sen (1947); Editor-in-chief: Tejen Guha Roy, Sm. Nilima Bose, Sm. Bithi Sen, Sunil Dasgupta, Pratul Bardhan Roy, Prithwish Roy Choudhury, Pranakrishna Bhattacharya and Bireshwar Banerjee (1948); Satyen Mukherjee and Sm. Jayasree Choudhury (1949); Madusudan Ghosh (1950); Arun Kumar Roy (1951); Smritibikash Ghosh (1952); Dulal Das 1953); Gopal Chandra Banerjee (1954); Samarendra Sengupta (1955); Ashim Sen Gupta (1956); Malayasankar Dasgupta (1957); Ajay Gupta (1958; Tripti Kumar Chatterjee (1959); Gopal Bandyopadhyay (1960); Sukanta kumar Roy (1961); Barun Kumar Chakravarty (1962); Jayanta Kumar Roy and Amit Kumar Gangopadhyay (1963).

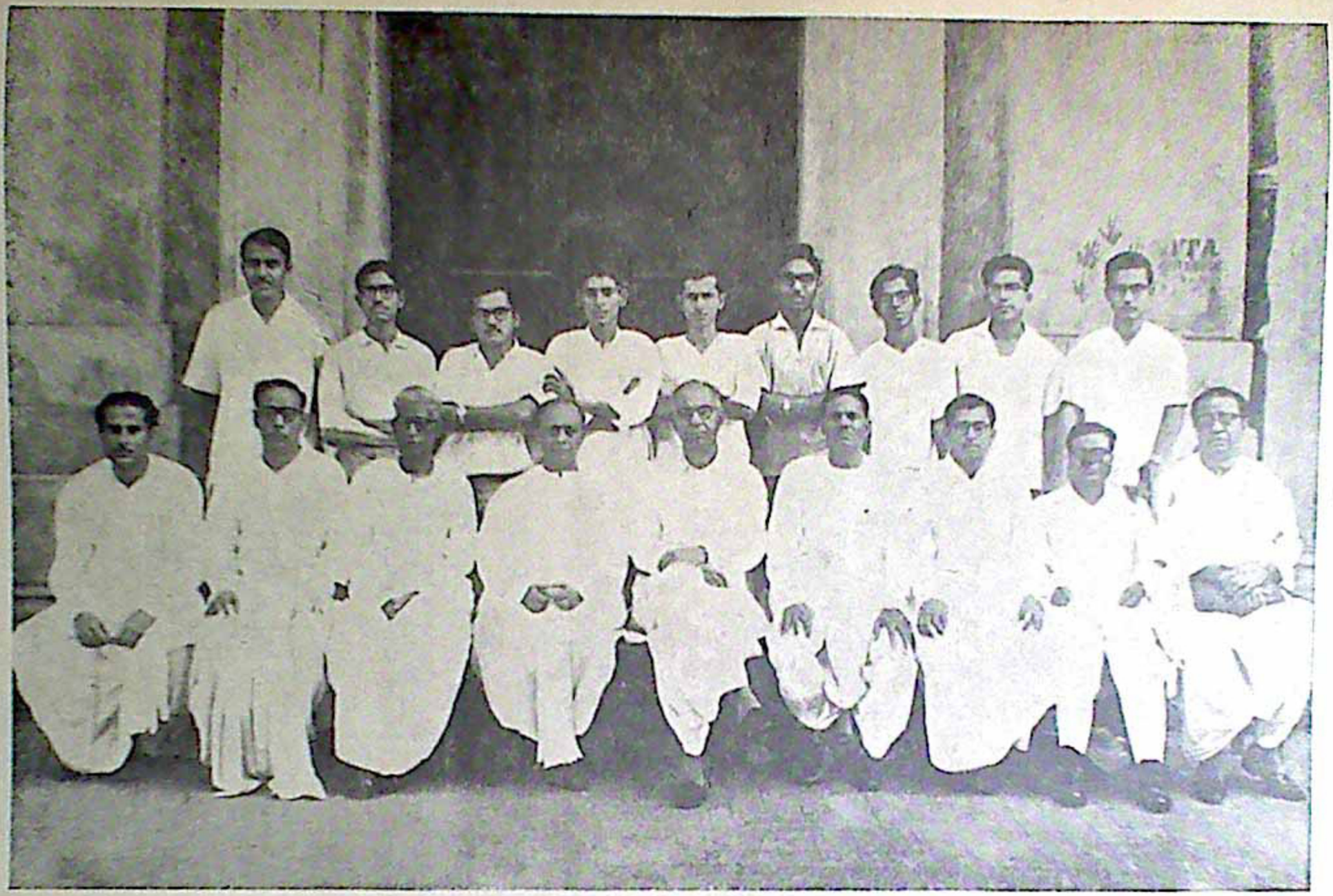

Sitting (from L to R) Prof. K. Mukherjee, Prof. N. Day, Prof. N. Sengupta(Vice President), Vice-Principal N. K. Bhattacharjee, Principal K. N. Sen (President), Prof. P. Chatterjee (Vice President), Prof. N. Mallick, Prof. N. K. Pathak (Treasurer), Prof. B. N. Chakravorty (President S. U.)
Standing (from L to R) A. N. Mukherjee (Asst. General Secy) P. Mukherjee, K. Bal (Editor), D. Bhadra,

Sitting on ground : (L to R) Pte. S. Mandal. Pte. S. Bag, Pte. S Chowdhury, Pte. S. Mukherjee.
Sitting on chair : (L to R) Sergent. A. Banerjee, A/o P. K. Roy, Div. Surgeon Dr. P K. Ghosh, Dist. Officer. J. N. Ghosh, Dist. Officer. S. Bose, Div. Supolt. A. R. Dutta, Sergent. D. Sahs. *Standing front rank (L to R)* Pte. S. Chatterjee, Pte. D Nayak, Pte. K. P. Sen, Pte. D. Majumder, Pte. P. K Chakravarty Pte. A. K. Roychowdhury, Pte. J. Singh, Pte. T. Chatterjee, Pte. S. Majumder, Pte. B. Nath, Pte. A

आशुतोष कालेज

पत्रिका

"नशीली निगाहें बदलते चेहरे"

ले०- सरदार जरनैल सिंह

(द्वितीय वर्ष साहित्य)

"उसकी मौत का कारण मैं ही हूँ। मैं हत्यारा हूँ। मैंने उसका खून किया है।".....और..... रमेश सिसक उठा।

रमेश के मानस-पट पर उसके जीवन की अतीत की घटनायें घूम पड़ी। वह पहले-पहल कलकत्ते आया था। उस समय उसकी उम्र भी क्या रही होगी –यही पाँच या छः साल की होगी। उसका बचपन गाँव के हरे-भरे खेतों, छोटी-छोटी नदियों और आम-जामुन के पेड़ों में से हो कर गुजरा था। उसे शहर का वातावरण जरा भी पसन्द नहीं था। जो मजा गाँव में है वह शहर में कहाँ? उसे अपने गाँव के साथियों की याद हमेशा आया करती थी। उनके साथ गाँव की धूल में लोटना और पेड़ों से गिरे हुए फलों को खाना इत्यादि इन सब घटनाओं को वह किसी भी तरह भूल नहीं पाता था। बचपन के साथी जो उसे पाठशाला जाते समय घर पर बुलाने के लिये आते थे और दिन भर पढ़ने के बाद शाम को खेलने के लिये साथ में ले जाते थे उनको वह भूल नहीं पाता था। उसे रह-रह कर उनकी याद आती थी। लेकिन समय एक ऐसी मलहम है जो किसी भी गहरे से गहरे घाव को अच्छा कर देती है। इस प्रकार दिन बीतने लगे और रमेश अपने भूत को वर्तमान की परिस्थिति में भूलने लगा।

रमेश के पिता ने उसे हिन्दी माध्यम के एक विद्यालय में भर्ती करा दिया। विद्यालय में लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। रमेश के ही कक्षा में आशा नामकी एक लड़की पढ़ती थी। वह रमेश से उम्र में दो वर्ष बड़ी थी? पता नहीं रमेश में उसे क्या दिखाई दिया था कि पहले ही दिन उसने उसे अपने पास बैठने के लिये स्थान दिया। आशा का घर रमेश के रास्ते में पड़ता था। छुट्टी होने पर दोनों साथ-साथ घर आते और जब आशा का घर आ जाता तो वह उससे अपने घर चलने को कहती. पर रमेश कहता—नहीं आशा! अब चलने दो, नहीं तो देर होने पर पिताजी नाराज होंगे। कुछ देर तक चुप रह कर आशा कहती—अच्छा जाओ। लेकिन कल पढ़ने जरूर आना।

और रमेश 'अच्छा आऊँगा' कहकर चला जाता। लेकिन कभी-कभी रमेश को आशा के घर जाना पड़ता था। घर आने पर उसे पिताजी की फटकार सुननी पड़ती और साथ ही उसके कोमल गालों पर पाँच अँगुलियों के निशान बन जाते।

रमेश के पिता फौज में सूबेदार थे। वे जिस तरह स्वयं अनुशासन में रहते थे उसी तरह अपने पुत्र को भी रखना चाहते थे। वे छोटी-छोटी गलतियों पर भी बिगड़ जाते थे। मनुष्य कभी-कभी कितनी बड़ी गलती कर बैठता है। वह स्वयं जिस परिस्थिति में रहता है दूसरों को भी उसी प्रकार का समझता है। यदि विद्यालय से लौटने में कुछ देर ही हो गई तो क्या हुआ। उस निर्दयी सैनिक बाप को पिता और पुत्र के सम्बन्ध को भी समझना चाहिये। लेकिन वे ठहरे फौजी आदमी—जिनका मुख्य ध्येय होता है आदेश का पालन करना। जिस तरह वे स्वयं आदेश पालन करते हैं उसी प्रकार दूसरों को भी आदेश पालन करते हुए देखना चाहते हैं। रमेश की माँ तो थी पर वह भी उस रुद्र पति के आगे कुछ न बोल पाती। पर पति के चले जाने पर बेटे को छाती में लगाकर रो पड़ती और अपने हाथ रूपी अमृतयुक्त जल से उन निर्दयी निशानों को धो देती। वह सिसकते हुए कहती—बेटा! जरा जल्दी आ जाया कर और रमेश माँ के आँसू पोंछते हुए कहता—रो मत माँ! कल से ठीक समय पर आ जाया करूँगा।

इस प्रकार रमेश ने चौथी कक्षा पास की। अब उसका नाम पाँचवीं कक्षा में लिखा जा चुका था। आशा भी पढ़ने में तेज होने के कारण उसके साथ ही थी। दोनों में बहुत पटती थी। इन तीन वर्षों में कभी भी दोनों में मन-मोटाव नहीं हुआ। लेकिन पाँचवीं में रमेश फेल हो गया और आशा पास हो गई। वह भी पुनः रमेश के साथ ही पढ़ना चाहती थी पर ऐसा नहीं हो सका। फिर भी उसने रमेश का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि इसके पीछे स्नेह और प्रीति का बन्धन था जो गत तीन वर्षों से चला आ रहा था। वह विद्यालय जाते समय और वहाँ से लौटते समय रमेश के ही साथ आती-जाती थी।

आशा एक धनी बाप की दुलारी बेटी थी। वह लाड़-प्यार से पली थी। उसके पिता कलकत्ते के एक बहुत बड़ा व्यापारी थे। जब आशा पाँच वर्ष की थी उसी समय उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। उसका एक भाई था उससे दो वर्ष छोटा। वह भी दो वर्ष तक संसार में रहकर अभागी बहन को छोड़कर अपनी माँ के पास चला गया। जब अकेली आशा ही घर में रह गयी थी। रमेश का चेहरा आशा के भाई से प्रायः मिलता-जुलता था। यही कारण था कि वह रमेश से इतना घुल-मिलकर मिलती थी। रमेश में उसे अपने भाई की आत्मा का आभास होता था। इसे वह अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। अगले वर्ष न उम्मीद होते हुए भी आशा फेल हो गई और रमेश पास हो गया। इस प्रकार पुनः दोनों एक ही कक्षा में आ गये।

लेकिन मनुष्य जो सोचता है वह शायद ही पूरा होता है। जिन्दगी में खुशियाँ आती हैं और चली जाती हैं। यह प्रकृति का नियम है कि कोई भी चिर-सुख या चिर दुःख में नहीं रहता है। सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख आता रहता है। सुख और दुःख का यह चक्र लगा ही रहता है। रमेश और आशा को भी इस चक्र में से गुजरना पड़ा। इन दोनों ने कभी यह नहीं सोचा था कि वे एक दूसरे से अलग होंगे। लेकिन प्रकृति के

नियम के सामने सबको हार माननी पड़ती है। दैवीगति से रमेश के पिता का कलकत्ते से अम्बाला स्थान-परिवर्तन हो गया। उसका दिल कलकत्ते रहने के लिये बहुत छटपटाया लेकिन वह मजबूर था। वह कुछ भी न कर सका और भाग्य ने उसे कलकत्ते से कई सौ मील दूर अम्बाला ला कर रख दिया ?

अम्बाला में भी वह एक विद्यालय में भर्ती हो गया। यहाँ आकर पहले-पहल उसका मन नहीं लगा। कलकत्ते की आशा के साथ बीते हुए समय की याद प्रायः आती थी। उसका दिल हुआ कि आशा को पत्र लिखें पर पता न होने से न लिख सका। अपना पता भी आशा को न दे सका था, इसलिये दोनों में पत्र-व्यवहार नहीं हो सका। कुछ दिन तक आशा की याद ने उसे बहुत सताया लेकिन कुछ समय पश्चात् वह आशा को प्रायः भूल ही गया।

दिन बीतने देर नहीं लगते। ऊपर की घटनाओं को प्रायः ६ वर्ष हो चुके थे। रमेश इन्टर पास कर चुका था। वह जवान हो चुका था। इसका पचपन जवानी के आगमन से डरकर अपना अस्तित्व मिटा चुका था। उसकी नस-नस में यौवन की लहरें तरंगित हो रही थी। पढ़ाई शुरू होने में देर थी। इसलिये समय काटने के लिये वह अपने चाचा के पास कलकत्ते चला आया। उसके चाचाजी एक सौदागरी कार्यालय में बड़े बाबू थे। प्रायः ४ वर्ष से इस कार्यालय में कार्य कर रहे थे। यहाँ आने पर रमेश को पुरानी आशा का ख्याल आया अतीत की तहों में जिस आशा को वह प्रायः भूल चुका था कलकत्ते आने पर वे तहें हट गई और आशा की याद पुनः ताजी हो गई ? दिल में बहुत आशा लेकर वह उसे खोजने चल पड़ा। पुरानी यादगार के सहारे वह घर तक पहुँच ही गया लेकिन जिस इरादे को दिल में रखकर वह गया था—पूरा न हो सका। मकान तो मिला पर आशा नहीं मिली। उस समय वह कहीं बाहर गई हुई थी। वह टूटे हुए दिल को लेकर वापस लौट आया।

शाम का समय था और वह भी कलकत्ते की शाम का, जहाँ पर दिन और रात का कोई अन्तर नहीं रहता है। इस समय खुशियाँ मुस्कराती थी और बगीचे के पत्ते तालियाँ बजाते थे। चारों तरफ लोगों की भरमार थी। स्त्री और पुरुष अपने बच्चों सहित टहल रहे थे। कितने ही मनचले युवक और युवतियाँ अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं का हाथ में हाथ पकड़ कर टहल रहे थे। इस समय अपने प्रिय की मीठी-मीठी बातें सुनने और उनको कहने के सिवा उनके लिए संसार की सभी चीजें तुच्छ थी। शायद यह शाम फिर न आये और उनकी बातें कहीं अधूरी न रह जाये। इसलिये वे जी-भर कर इस सुयोग को लूट रहे थे।

रमेश भी इस समय शाम का आनन्द लूटने निकला था। नाना प्रकार के नयनाभिराम, मनोहर और सुन्दर दृश्यों का अवलोकन करते हुए वह आगे बढ़ रहा था। 'रमेश' नाम की मधुर ध्वनि सुनकर वह चौंक पड़ा। स्वर किसी नवयुवती का था। वह सोच नहीं पा रहा था कि इन विशाल गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के बीच इसे पुकारनेवाला कौन था। उसने जब स्वर का अनुकरण किया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक चाँद-सा सुन्दर मुख आकाशरूपी मकान की खिड़की से उसकी तरफ देख रहा था ? यह सुन्दर-सलोना चाँद-सा मुखड़ा किसी और का नहीं—उसकी अपनी आशा का ही था। जिसे देखने के लिए वह

कई दिनों से कोशिश कर रहा था। उसे एकाएक देख लेने से उसके आनन्द की सीमा न रही। उसका दिल खुशी से उछलने लगा। वह सोच रहा था कि ऊपर कैसे जायँ तब तक आशा ने कहा—रुको, मैं आती हूँ। उसी समय सीढ़ियों से उतरने की मधुर पद-ध्वनि सुनाई पड़ी और खट् शब्द के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसने जिस सौन्दर्य को देखा वैसा जीवन में और कभी नहीं देखा था। उसकी पहले की आशा और इस साक्षात् खड़ी सौन्दर्य की मूर्ति में कितना अन्तर हो चुका था। वह यौवन की मंजिल की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रही थी। उसका सुन्दर मुख कालेबालों के बीच अत्यन्त सुशोभित हो रहा था। उसके चेहरे में सब से अधिक आर्कषक कोई चीज थी तो वे उसकी नशीली निगाहें- जिसे देखने से अनायास ही किसी के दिल पर तीर चल जाते थे और वे गहरे जखम बत जाते थे, जिसे देखने से बिना शराब पिये ही नशा आने लगता था। इस तरह रमेश को अपनी तरफ घूरते देख आशा ने कहा—अन्दर आ जाओ। क्या बाहर से ही इस तरह देखते रहोगे। रमेश की खुमारी टूटी और वह अन्दर चला आया। छोटे बड़े कई कमरों को पार कर वे दोनों एक कमरे में आये। आशा रमेश को कमरे में बैठा कर स्वयं किसी कार्यवश अन्दर चली गई।

कमरा अच्छी तरह सुसज्जित था। एक तरफ पलंग बिछा हुआ था। पलंग के दूसरी तरफ एक मेज और एक कुर्सी पड़ी हुई थी। मेज पर मोटी-मोटी किताबें पड़ी हुई थी। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। दीवालों पर चित्र टंगे हुए थे। उसमें रमेश के भी कई चित्र थे। कोई तैल चित्र था तो कोई जल रंगों से बनाया गया चित्र था। एक पुराना चित्र था प्रायः छः वर्ष पहले का—वह भी कैमरे से खींचा हुआ। रमेश चित्र को देखकर मुस्करा पड़ा। क्योंकि चित्र के रमेश और अब के रमेश में कितना अन्तर आ चुका था यह कमरा आशा का शयन कक्ष था।

रमेश यही सब देख रहा था कि आशा ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक प्लेट थी। उसमें कुछ खाने का सामान था। आशा ने एक मेज खींच कर प्लेट उस पर रख दी, "लो, कुछ खा लो" कह कर स्वयं एक कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर में नौकर चाय लेकर आया और मेज पर रख कर चला गया।

रमेश ने देखा प्लेट में बहुत सी जलपान की सामग्री है। उसने एकबार आशा की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा—यह जलपान केवल मेरी ही लिये है या या सारे शहर का राशन है।

यह सुनकर आशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह बोली—सब खाना पड़ेगा। यदि एक भी सामान छोडा तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैंने यह सब अपने हाथों बनाया है। जलपान करते समय आशा ने पूछा—अच्छा, सच-सच बताओ, इन छः वर्षों में तुम्हें कभी भी मेरी याद आई थी।

"मैं तुम्हें बहुत याद करता था आशा ?" रमेश ने उत्तर दिया, लेकिन ... ...बात काटते हुए आशा ने कहा—हट्! झूठा कहीं का ? याद करता होता तो पत्र भी न देता।

"इसके लिये सच ही मैं बहुत दुःखी हूं आशा ?" तुम्हारा पता नहीं मालूम होने के कारण मैं तुम्हें पत्र न दे सका, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूला नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद करता आया हूं। मुझे क्षमा कर दो आशा ?" रमेश ने कहा,

आशा ने जैसे उसे क्षमा कर दिया हो और बोली—अच्छा अच्छा ? चाय पीलो नहीं तो ठण्डी हो जायेगी।

जलपान के पश्चात् आशा ने पूछा—इस समय क्या करते हो ?

—इन्टर पास कर चुका हूं। विचार है कि आगे पढ़ूंगा। पर तुम इस समय क्या कर रही हो ?

मैंने भी इन्टर पास कर लिया है। आगे पढ़ने का विचार था। पर पिता जी शादी के लिये तैयार हैं। इसलिये शायद आगे नहीं पढ़ पाऊँगी, और हाँ ! तुम्हारी शादी हुई की नहीं।

अभी तो श्रीमान जी अकेले ही हैं, और फिर तुम से पूछे बिना शादी कैसे कर सकता हूँ।

यह सुनकर आशा मुस्करा पड़ी ! रमेश ने घड़ी के तरफ देखते हुए कहा—अरे ! नौ बज गये। अच्छा आशा ! अब मुझे जाने की आज्ञा दो।

—थोड़ी देर और बैठो ना।

—नहीं आशा ? बहुत देर से निकला हूँ। बेकार ही चाचा जी परेशान होंगे, अब और अधिक न रोको।

—परेशान होने की क्या बात है, तुम तो अब बच्चे नहीं रहे।

—पर चाचा जी के लिये अभी तक बच्चा ही हूं।

आशा और रमेश एक साथ उठे। आशा उसे दरवाजे तक पहुंचाने आई। चलते समय उसने कहा—कल सबेरे ही पिता जी बाहर जायेंगे। शायद रात को नहीं लौटेंगे। घर में अकेली ऊब जाऊँगी। इसलिये यदि समय मिला तो कल शाम को आ जाना।

'अवश्य आऊँगा' कह कर रमेश घर से बाहर चला गया। आशा उसे देखती रही जब तक वह आँखों से ओझल न हो गया। बहुत दिनों की पुरानी याद फिर ताजी हो गई। उसे अपने भाई सुरेश की याद आ गई। यदि वह जीवित होता तो

लेकर वह धीरे-धीरे अपने कमरे में गई। सु की तस्वीर को देखते ही वह रो पड़ी। कुछ पहले दर्द का जो तूफान दिल में उठा था आँसुओं के रूप में वह निकला। वह पलंग लेट गई और तकिये को सीने से दबा कर फफ फफक कर रोने लगी, और पता नहीं कब तक रो रही। इसी अवस्था में उसे नींद आ गई और निद्रा देवी की गोद में लीन हो गई।

मनुष्य जब अत्यन्त दुःखी हो जाता है हृदय में एक भारीपन सा आ जाता है। रोने आँसुओं के रुप में वह कर वह हल्का हो जाता आशा जब सोकर उठी तो उसका मन प्रफुल्लि था। अपने नित्य कार्यों को समाप्त कर वह उपन्यास लेकर बैठ गई। उसके मुख पर अ भावों से पता चलता था कि अपन्यास अत्य दिलचस्प है। उसे पढ़ने में वह इतनी मग्न थी उसे समय का भी ध्यान न रहा। उसकी भाव उस समय टूटी जब घड़ी ने टन् टन् करके च बजाये। वह जल्दी से उठी। आईने के सा आकर अपने वस्त्रों को यथास्थान किया और र वाली खिड़की के पास आ कर खड़ी हो गई। र के आने का समय हो गया था इसलिये वह उ इन्तजार में वहीं पर टहलने लगी। बीच-बीच खिड़की से झांक कर नीचे देख लेती थी।

प्रायः पाँच बजे रमेश आया। आशा ने देख लिया था। वह नीचे गई और रमेश अपने कमरे में ले आई। रमेश को वह एक रुप में दिखाई पड़ रही थी। पिछले दिन से अ

उसकी नशीली निगाहें रमेश को परेशान कर रही थी। कौन जानता है उन नशीली निगाहों ने कितने चेहरों को बदला हो। रमेश का सारा शरीर एक प्रकार का सुख अनुभव कर सिहर उठा, उसने उन निगाहों को फिर एक बार देखा। धड़कते हुए दिल से उसने कहा—आशा! इतनी दूर क्यों बैठी हो, आओ, हम दोनों एक साथ पलंग पर बैठ कर बात-चीत करें। इतना कहकर वह अपने स्थान से उठा और आशा का हाथ पकड़कर पलंग के पास ले आया। रमेश के कदम लड़खड़ाये और आशा के पलंग पर बैठने के पहले ही उसने उसे अपने वक्ष से लगा लिया। पहले तो आशा कुछ समझ न सकी और किसी अज्ञात शक्ति के कारण रमेश से और लिपट गई पर तत्काल ही परिस्थिति का अनुमान कर उसने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया और बोल—यह क्या रमेश! छोड़ दो मुझे। लेकिन रमेश की पकड़ ढ़ीली होने का बजाय कसती ही गई। क्योंकि नशीली निगाहों ने अपना वार कर दिया था। आशा ने अपने को उसके बन्धन से छुड़ाने का असफल प्रयास किया-पर छूट न सकी। रमेश के अधर आशा के अधरों से मिलने ही वाले थे कि रमेश के मुख से आह निकली और वह उसके बन्धन से अलग हो गई। आशा ने उसके कन्धे पर दाँत से काट दिया था। उसका सम्पूर्ण शरीर क्रोध और ग्लानि से काँप रहा था। उसने कहा—रमेश! मैं आज तक तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती आई हूं। शायद तुम नहीं जानते हो कि मेरा एक छोटा भाई भी था। उसका चेहरा बिलकुल तुमसे मिलता-जुलता था। यही कारण था कि मैं तुम से इतना निकट होकर मिली थी। लेकिन आज तुमने एक बहन के पवित्र प्यार पर कींचड़ उछाल दिया। तुमने मेरे हृदय में अपने और पुरुष जाति के प्रति घृणा पैदा कर दी मुझे कहीं का न छोड़ा। तुमने मुझे जो कष्ट दिया है इसके कारण जीवन में कभी सुखी न होओगे। नहीं मालूम था कि पुरुष इतने नीच होते हैं, निकल जाओ मेरे घर से और कभी अपना मुँह न दिखाना, इतना कहकर वह लिहाफ में मुख छिपा कर फूट-फूट कर रोने लगी।

रमेश का चेहरा फीका पड़ गया। शर्म से उसका सिर नीचे हो गया था। किसी तरह सीढ़ियों से नीचे उतरा और मकान से बाहर चला गया।

दूसरे दिन समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ प्रकाशित हुआ—"कलकत्ते के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ दौलत राम की पुत्री आशा ने आत्म हत्या कर ली, पर कारण अज्ञात है।" रमेश ने भी यह समाचार सुना। इसे सुनकर वह जैसे पागल सा हो गया। वह अपने को सम्हाल न सका और आज वह चला जा रहा था मन में विचार लिये कि मैंने ही आशा का खून किया है। मैं ही उसका खूनी हूँ। वह चलता जा रहा था पर कहाँ? .....यह शायद उसे भी पता नहीं था।

कुछ दिनों बाद कलकत्ते की सड़कों पर एक नवयुवक अपने ही आप से न जाने क्या-क्या बातें करता देखा गया। उसके शरीर पर फटे-पुराने चिथड़े थे। सिर के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वह कभी हंसने लगता था, कभी रोने लगता था। कभी आशा .....आशा..... की रट लगाता था। यह नवयुवक कोई और नहीं.....।

छाया

गोपाल शरण सिंह,

(विज्ञान द्वितीय वर्ष)

वे रातें कितनी सुन्दर,
जब मैं था और मधुर जनी,
होकर रत्नों से शोभित,
चन्द्रालय चमक रहा था।

जब मेरे मानस-तट पर,
मधुवात विकल था फिरता,
सुख चांद हिलोरे लेता—
कि उज्ज्वल जाल फैलाकर

छाया-पथ में जीवन में,
ज्योत्स्ना मन्थर गति बहती
मृदु-मृदु भावों की लहरें,
अभिनव पट पर थी करती।

ज्योत्स्ना थी शान्त निशा थी,
आधार एक का एक था—
दोनों की अमलिन छाया,
थी एक-एक से मिलती।